KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 cm.
Vol. & Number ৪৬/৭ ৪৬/৮ ৪৬/৯ ৪৬/১০ ৪৬/১১	Year of Publication : Nov 1987 Dec 1987 Jan 1988 Feb 1988 March 1988
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

নভেম্বর ১৯৮৭

প্রাচীন ভারতে ভাববাদী দর্শনচিন্তা ছিল প্রচলিত শোষণব্যবস্থার পরিপূরক—এই সিদ্ধান্ত বিশদ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করেছেন ড. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "দর্শন ও রাজনীতি" প্রবন্ধে।

ভারতীয় মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মূল ধারাটি কিভাবে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারা হিসাবে বিবর্তিত হয়ে গেল, তার বিস্তারিত বর্ণনা অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র "ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ" প্রতিবেদনে।

"আগামী প্রজন্ম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক সন্দর্ভে রবীন্দ্রসংগীত যে নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিমতাসর্বস্ব জীবনের চৌহদ্দির বাইরেই বেশি উপভোগ্য, এবং আজকের গ্রামবাঙলার অন্ত্যজ মানুষেরাই হতে পারেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত উপভোক্তা —সারবান যুক্তি আর তথ্যের সাহায্যে এই বক্তব্য বিশদ করেছেন ডঃ তপোব্রত ঘোষ।

অপ্রকাশিত বিভিন্ন সূত্র থেকে সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্য "প্রসঙ্গ ঃ প্রচার-অনীহ মুজতবা" নিবন্ধে।

বাংলাদেশের নাট্যকলার উদ্ভব, বিকাশ, সংকট ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা।

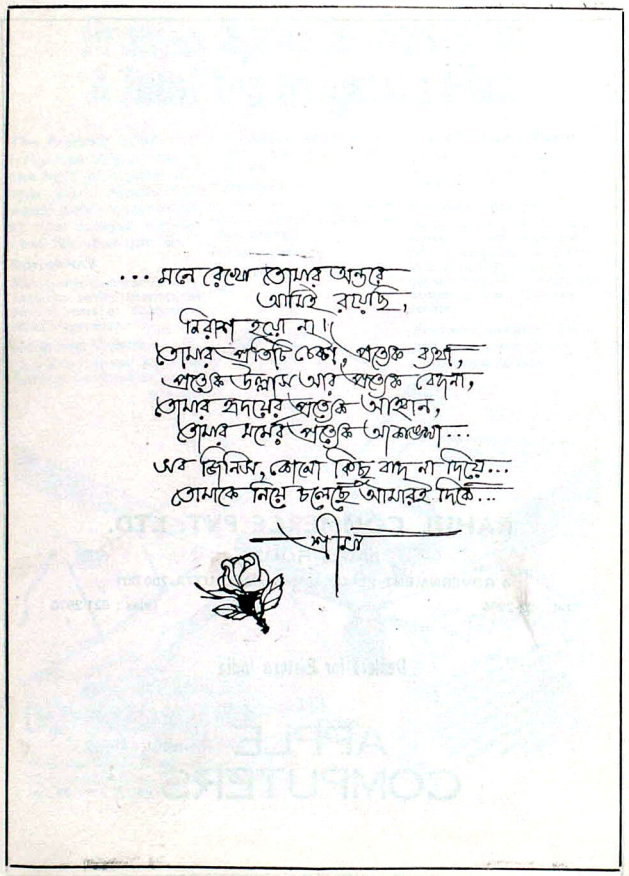

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৮৭
কার্তিক ১৩৯৪

দর্শন ও রাজনীতি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫৬৯
ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ অমলেন্দু দে ৬০২
আগামী প্রজন্ম ও রবীন্দ্রসংগীত তপোব্রত ঘোষ ৬২৭

হে ঈশ্বর কত লাশ! সমর সেন ৫৮৪
অতীতের ছবি শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৫৮৫
পরস্পর নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার ৫৮৬
বোধ দেবাশিস প্রধান ৫৮৭
যন্ত্রণার বিবিক্ত উঠোন সুজিত সেন ৫৮৮
তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৫৮৯
মধ্যরাত্রির জীবনী রবিশংকর বল ৬২০

গ্রন্থসমালোচনা ৬৩৩
সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ ৬৪৪
প্রচার-অনীহ মুজতবা নূরুর রহমান খান

নাটক ৬৪৮
বাংলাদেশের নাটক অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রকলা ৬৫৯
বিকাশ ভট্টাচার্যের চিত্রপ্রদর্শনী হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২১-৬৩২১

Oxford Titles in History

SIDNEY AND BEATRICE WEBB
Indian Diary Rs 140

ASHIN DAS GUPTA &
M. N. PEARSON, *Ed.*
India and the Indian Ocean
1500-1800 Rs 240

PAUL N. SIEGEL
The Meek and the Militant
Religion and Power Across the World Rs 120

ANITA INDER SINGH
The Origins of the Partition of India
1936-1947 Rs 140

SHIREEN MOOSVI
The Economy of the Mughal Empire
c. 1595 Rs 195

MUZAFFAR ALAM
The Crisis of Empire in Mughal North India
Awadh and the Punjab 1707-1748 Rs 175

RAYMOND K. RENFORD
The Non-Official British in India to 1920 Rs 220

A. TOM GRUNFELD
The Making of Modern Tibet Rs 150

B. P. SINGH
The Problem of Change
A Study of North-East India Rs 110

DAVID C. POTTER
India's Political Administrators. 1919-1983 Rs 190

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

'রূপা'র বই

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্র-চরিতম্ ২৫.০০

বাণভট্ট / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
হর্ষচরিত ৪০.০০

যুগল শ্রীমল
আমাদেরও কিছু করবার আছে ১৫.০০

ডঃ অশোক মিত্র
[প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার]
সমাজসংস্কা আশানিরাশা ২৫.০০

ডঃ অশোক মিত্র / মালিনী ভট্টাচার্য
ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা প্রতিদিন ৩০.০০

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্সী
সপ্তাসঙ্গু ১০.০০

নৃপেন্দ্রনাথ বাকচি
গীতা-প্রসঙ্গে ২০.০০

সরলা দেবী চৌধুরানী
জীবনের ঝরাপাতা ২৫.০০

নেরুদা / ডাঃ ভবানীপ্রসাদ দত্ত
অনুস্মৃতি ৪০.০০

* * *

MAN AND HIS WORLD
BEING A PLAIN AND UNVARNISHED TALE OF THE NATIONS
By JUGAL SHRIMAL
Published by
Nehru Children's Museum
and
National Cultural Associations
Rs. 96.00

রূপা
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দর্শন ও রাজনীতি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস মেরিমাতার গর্ভধারণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাঁদের সঙ্গে হাজার তর্ক তুলেও লাভ নেই। বিশ্বাসটা তাঁদের কাছে এমনই পবিত্র যে তার দেবালয়ে তর্কাতর্কির মতো ম্লেচ্ছ ব্যাপারের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাঁরা মায়াবাদের মতো চরম ভাববাদকে বিশুদ্ধির তুল্য মর্যাদা দিয়ে যুক্তিতর্কের নিষেধ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের কথায় ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে বেশির ভাগই বস্তুত কান দেন নি ; দিলে ভারতীয় দর্শনের পুরো ঐতিহ্যটাই বরবাদ হয়ে যেতো। দেশে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে দার্শনিক বিতর্কের ঝড় বয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে।

তবুও সাধারণভাবে দর্শনের বিশুদ্ধি নিয়ে একটা কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত। অনেকেই মনে করেন, দর্শন বলতে নির্মল সত্যের সন্ধান। তার সঙ্গে সমাজনীতি বা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য সম্প্রতি এ-জাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের অনুগামীরা দাবি করেন, অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতির সঙ্গে দর্শনেরও একটা নাড়ির বন্ধন মানতে হবে। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ বলবেন, প্রোপাগানডার খাতিরে ওঁরা তো কত কথাই না বলে থাকেন ! সংগ্রাম আর সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম, মতাদর্শের সংগ্রাম, কতো কী !

প্রোপাগানডা শব্দটা তেমন ভালো নয়। গালাগালির মতো, যদিও হয়তো কিছুটা মার্জিত ভাষার প্রলেপ মাখানো। কিন্তু তা যাই হোক না কেন, শব্দটা আপাতত স্বীকারই করে নেবো। প্রোপাগানডা আছে। তবু প্রশ্ন ওঠে : কার বা কাদের তরফে প্রোপাগানডা ? রাজনীতিবাজ বলে যাঁরা অভিযুক্ত ? না তাঁদের বিপক্ষদলের ? অনেকেরই বক্তব্য, ওই রাজনীতিবাজদের। আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আপত্তি উঠবে : ছোটো মুখে বড়ো কথা ! বর্তমান লেখক তো সত্যিই তেমন কেউকেটা নয়। মানলাম। আমি তাই এমন একজনের উক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করতে চাই যাঁকে অবজ্ঞা করা অন্তত আমাদের দেশে অতিবড়ো কেউকেটার পক্ষেও সোজা কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির এবং সমাজনীতির অন্তত অনেক সময় যোগাযোগটা যে অত্যন্ত প্রকট—এই কথাটা একবার তাঁর চোখের সামনে একেবারে জ্বলজ্বলে হয়ে ভেসে উঠেছিলো।

১৯৩২-এর কথা। বিমানভ্রমণ তখন আজকের মতো নেহাত আখছার ব্যাপার হয় নি। তখনকার পারস্য বা আজকের ইরান থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এলো। ঠিক হলো, বিমানপথে যাওয়াই সুবিধার হবে। কবির জীবনে এই হলো বিমানভ্রমণের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা; এর আগে মাত্র লনডন থেকে প্যারিসে যাবার সামান্য একটু আকাশ।

পারস্যের পথে বোগদাদে বিমানপোত কিছুটা বিশ্রামের জন্য নামলো। 'বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে'…

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার দিক থেকে পুরো ব্যাপারটাই যেন অসম্ভবের কোঠায় পৌঁছবার মতো। মানুষের পক্ষে মানুষের বিরুদ্ধে এ-রকম হত্যার আয়োজন কী করে সম্ভব হতে পারে! বোঝবার চেষ্টা করলেন। মনে হলো, নিজের নতুন বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি থেকে ব্যাপারটার হয়তো কিনারা খোঁজা যায়। মাটির পৃথিবী ছেড়ে মানুষ যতোই উর্ধ্বলোকে উঠে যায় মাটির পৃথিবীর মানুষগুলোর কথা ততোই মুছে যায় চেতনা থেকে। তখন আর বড়ো রকমের খুনখারাপিটার হুঁশ থাকে না। কিন্তু এমনতরো ব্যাপার শুধু বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দার্শনিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রেও মোটের উপর একই ব্যাপার। দার্শনিকের কৌশলেও মানুষকে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে এমন এক মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া যায় যেখান থেকে মোটের উপর একই-ভাবে রাজনীতির চাহিদা মেটানো সম্ভব, সম্ভব নির্বিচারে নরহত্যা। দার্শনিক চিন্তাচেতনা তাই সবসময় নির্বিকার সত্যান্বেষণ নয়; বরং অনেক সময় রাজনীতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ :

'বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটামাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম, সে ক্রমে এলো ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব তা হয়ে এল দুই আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকায় দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বের হয়, তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ—অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কে-ই বা আপন, কে-ই বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনা-বাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। (পারস্যে)।

উপরের উদ্ধৃতিতে অংশবিশেষের উপর জোর দেবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় না থাকলেও আমাদের উৎসাহে করেছি। মনে হয়েছে তার দরকার ছিলো। পাঠকদের নজর বিশেষভাবে আকর্ষণ করার দরকার। উৎসাহী পাঠক হয়তো একাধিকবার পড়তে পারেন।

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ

একথা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ যে আমার-আপনার মতো কারুর পক্ষেই কথাগুলো এমনভাবে বলবার ক্ষমতা কল্পনাতীত। কিন্তু একথা বলার বোধ হয় দরকার আছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বলেই, কথাগুলো সহজে উড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও মূঢ়তা হবে। একই কারণে, এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু ভাববারও আছে, বোঝবারও আছে।

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রসঙ্গে সম্প্রতি নানা বিদ্বান নানা আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে কোনো এক সুসংহত সর্বাঙ্গসংগত দার্শনিক দৃষ্টির বর্ণনা দিতে চান তাঁদের দুঃসাহস অন্তত আমাকে অবাক করে। সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতিতে তাঁর চিন্তা-চেতনা অনড়-অচল হয়ে থাকে নি। রবীন্দ্রদর্শন বলে অবিচল কিছুর সন্ধানে মুগ্ধ হবার কারণ নেই। কথাটা এই কারণে বলছি যে, সুবিশাল রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে উপরোদ্ধৃত কথার বিপরীত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। হয়তো নিজেই তার অল্পবিস্তর তালিকা তৈরি করতে পারি; তবে অসামান্য শ্রম ও বিদ্যার সাক্ষ্য নিয়ে পম্পা মজুমদার-এর "রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস" তো হাতের নাগালেই রয়েছে।

অব্যবস্থিতচিত্ত বলে গালপাড়ার সাহস থাকে তো পাড়ুন; প্রাণপরিবর্তনের ছন্দে বাঁধা বলে উচ্ছ্বাস করতে চান তো করুন। বর্তমান উদ্দেশ্য এ-জাতীয় কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তির সঙ্গে আলোচ্য উক্তির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা না তুলে উদ্ধৃত উক্তিটিরই তাৎপর্য বিচারের চেষ্টা করবো। দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির যে একটা সম্পর্ক আছে—তারই নিদর্শন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বিদ্যাবহুল বহু বৃহদাকার গ্রন্থেও তার তুলনা খোঁজা নিষ্ফল। কিন্তু বিষয়টি বোঝবার জন্যে ধাপে-ধাপে এগুতে হবে।

বাস্তবের বা মাটির পৃথিবীর প্রতি সহজাত টান। কথাটা নানা দার্শনিকদের মুখে শোভা না পেলেও বস্তুবাদীর মুখে নিশ্চয়ই শোভা পায়। তার মানে, রবীন্দ্রনাথকে বস্তুবাদী বলে ঘোষণা করার দরকার নেই। তবুও কথাটা বস্তুবাদসম্মত, বস্তুবাদ শব্দটার প্রতি বিশেষ করে রবীন্দ্রভক্তদের মনোভাব যাই হোক না কেন। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় দার্শনিকদের অনেকের কাছেও কথাটা রুচিকর নয়। কিন্তু অন্তত চার্বাকের মুখে অনায়াসেই মানিয়ে যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য-নির্ভর এই পৃথিবীর চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকলে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথাটাও ভোলা যায় না। এ কথাও চার্বাকের মুখেই শোভা পায়। চার্বাকও বলেন, মাটির পৃথিবী এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুচ্ছ করে লোকোত্তরের কল্পনা দিয়ে ধর্মান্ধ মুগ্ধ মানুষকে বঞ্চনা করার আয়োজন। তাই প্রচলিত রবীন্দ্রভক্তদের সংস্কারে যতোই বাধুক না কেন, তাঁর আলোচ্য উক্তির প্রথমাংশে যে চার্বাক-সম্মত বা অন্তত তারই খুব কাছাকাছি চিন্তার পরিচয়—এমনতরো কথা উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

কিন্তু চিন্তাচেতনা থেকে এই মাটির পৃথিবী আর সে-পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কথা মুছে ফেলার কায়দাও আছে। মাটির স্পর্শ ছেড়ে যতো মহাশূন্যে ওঠা যায়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়র সাক্ষ্য-নির্ভর মাটির পৃথিবী, চেতনা থেকে ততোই বিলীন হয়ে যায় সেই পৃথিবী। উড়ো-জাহাজের ওড়বার অভিজ্ঞতায় তো তা প্রকট। কিন্তু অমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়াও আর একরকম কায়দা আছে; সাধারণের চোখে না পড়লেও ব্যাপারটা

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। মতাদর্শগত ব্যবস্থা, বা আরো ছোটো করে বললে বলা যায় দার্শনিক কায়দা। সে-কায়দায় মাটির পৃথিবী এবং তার রক্তমাংসে গড়া মানুষগুলোর কথাও চেতনা থেকে মুছে ফেলা যায়। বিশুদ্ধ চেতনা ছাড়া তখন আর কিছু বাকি থাকে না। সেইটাই তখন পরম সত্যের একমাত্র দাবিদার হয়ে দাঁড়ায়। দার্শনিকদের পরিভাষায়, একেই বলে চরম ভাববাদ।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা অবশ্য দার্শনিকদের পরিচিত পরিভাষায় বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথাটা একই। প্রমাণ, দার্শনিক সাহিত্য থেকেই তাঁর উদ্ধৃতি : 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' উদ্ধৃতিটার উদ্দেশ্য অবশ্যই তারিফ নয়। ঘৃণা বলুন, শ্লেষ বলুন, বা আরো অন্য কোনো বর্ণনা দেবার উৎসাহ থাকে তো তাই-ই দিন। কিন্তু দার্শনিক মতটিকে দার্শনিক পরিভাষায় চরম ভাববাদ ছাড়া আর কোনো আখ্যা দেওয়া যাবে না। এবং এই মত বা এ-জাতীয় মতের রাজনৈতিক উপযোগিতার দিকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। মতটার পক্ষে এমনই প্রোপাগানডা যে সাধারণের মনে তা ভয়ভক্তির উদ্রেক করে। তবুও তারই পিছনে যে বীভৎস রাজনৈতিক উৎসাহ তাই-ই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তাহলে দর্শনে প্রচলিত পরিভাষায় মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ। বাঁচবার পথ আর মারবার পথ। মার্কসবাদে যাঁদের আস্থা তাঁরাও মূলত একই কথা বলেন। তবে অন্য পরিভাষায়, অন্য ভাবে। কিন্তু মোদ্দা কথাটাকে নিছক রাজনীতিবাজদের কারসাজি বলে গালপাড়তে চাইলে রবীন্দ্রনাথ অন্তত যখন উদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন তখন তাঁকেও এই দলে ফেলতে হবে। যাঁর সে সাহস আছে, তিনি ফেলুন। কিন্তু আমার সাহসে কুলোবে না। আশা করি অনেক পাঠকের সাহসেও নয়।

উদ্ধৃতিটি নিয়ে অনেক কথাই ভাববার আছে। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' শরীরকে হত্যা করলেও তাকে সত্যি হত্যা করা হয় না। কাকে? পরমাত্মাকে। কেননা পরমাত্মা অজর, অমর, শাশ্বত সত্য। তার জন্ম নেই। মৃত্যু নেই। তাই-ই পরব্রহ্ম। পারমার্থিক সত্য।

কোথা থেকে উদ্ধৃতি? চলতি ধারণায় 'গীতা' থেকে। কথাটা সত্যি। কিন্তু পুরো সত্যি নয়। 'গীতা'য় একথা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা কোটেশন মাত্র। কোথা থেকে কোটেশন? 'কঠ উপনিষদ্' থেকে। আসলে গীতা'র ২।১৯-২০ শ্লোকদুটি 'কঠ উপনিষদ্'-এর ২।১৮-১৯ শ্লোকেরই পুনরুক্তি। আমাদের মতো উপনিষদ্-এর অতি সাধারণ ছাত্রেরও তা চোখে পড়বার কথা। আত্মা বা পরমাত্মা প্রসঙ্গে "কঠ উপনিষদ্"-এ বলা হয়েছে—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১৮

হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তং হতঃ চেৎ মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ নায়ম্ হন্তি ন হন্যতে॥১৯

—আত্মা বা পরমাত্মার জন্ম নেই, তা শাশ্বত ও পুরাণ। তাই শরীর হত্যা করলেও তাকে হত্যা করা যায় না। খুনে যদি মনে করে সে খুন করছে, নিহত যদি মনে করে তাকে খুন করা হচ্ছে—উভয়ের পক্ষেই মনে রাখা দরকার এই আত্মাকে খুন করাও যায় না, তার হত্যাও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথকে 'উপনিষদে'র সাধারণ পাঠকদের কোঠায় ফেলা অবশ্যই ধৃষ্টতা হবে। কৈশোর থেকেই তিনি উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ। উদ্ধৃতিটুকু তাই আসলে যে উপনিষদ্ থেকে কোটেশন মাত্র, একথা তাঁর জানা ছিল না বলে কল্পনা করার কোনো সুযোগ নিশ্চয়ই নেই। তা ছাড়া, দার্শনিক আলোচনায় অন্তঃসংগতির কথাটাও তো রয়েছে, 'ন হন্যতে'

ইত্যাদির উপদেশকে আলাদা করে বোঝবার সুযোগ নেই ; একটা গোটা দার্শনিক মতের অঙ্গ হিসেবেই কথাটা বোঝা দরকার। সেই গোটা দর্শন বলতে ভারতীয় চরম ভাববাদ—নামান্তরে শূন্যবাদ, মায়াবাদ, পরব্রহ্মবাদ। এই দার্শনিক মতটির পক্ষে এবং বিপক্ষে আমাদের দেশে দার্শনিক বিতর্কের প্রবল ঝড় বয়েছিল। তাই মতটির পর্যাপ্ত মূল্যায়ন সংকীর্ণ পরিসরে বৃথা চেষ্টা। এবং আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা বহুলাংশেই অবান্তর। এখানে আমাদের আলোচনাটা দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে। কেননা, চার্বাকের বিপক্ষে সুদীর্ঘ যুগ ধরে সম্ভব-অসম্ভব রকমারি প্রোপাগানডা শুধু নির্লিপ্ত সত্য-অন্বেষণেরই পরিচায়ক নয়। তার একটা মস্ত বড়ো কারণ রাজনীতি। অর্থাৎ রাজনীতির নায়কদের পক্ষে দার্শনিক সত্যাসত্য নিয়ে কতোটা মাথাব্যথা ছিলো তার আলোচনাও এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, চার্বাক দর্শন প্রশ্রয় পেলে রাজনীতির দিক থেকে তাঁদের সর্বনাশ। তাঁদের সমাজ-আদর্শের ভিতটাই মিশমার হয়ে যাবার ভয়। পক্ষান্তরে, আদর্শ সমাজ হিসেবে তাঁরা যে চিত্র রচনা করেছেন তার নিরাপত্তার জন্যে পাইক-পেয়াদা, বাহুবল-অস্ত্রবল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপকরণগুলি ছাড়াও মতাদর্শগত হাতিয়ারের—বা সোজা কথায় দার্শনিক চিন্তাচেতনার—বিশেষ ভূমিকা আছে। এই কারণেই তাঁরা দর্শনপ্রসঙ্গে নির্বিকার থাকেন নি। তাই তাঁদের প্রবক্তা দেশের আইনকর্তারা দর্শনবিশেষকে শ্রেয় বা উপাদেয় বলে ঘোষণা করেছেন, আবার দর্শনবিশেষকে বিষবৎ পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রেয় বা উপাদেয় বলতে অবশ্যই অধ্যাত্মবাদ। বিষবৎ বলতে তেমনই বস্তুবাদ—বিশেষ করে চার্বাক মত। আইনের হুমকি। অতএব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থাও। মনে রাখতে হবে, এ-জাতীয় আইনের সঙ্গে সত্যান্বেষণের সম্পর্ক নেই ; সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক কার্যকারিতার, উপযোগিতার। দেশের মানুষকে তাঁরে রাখবার পক্ষে কোন্ দার্শনিক মত সুবিধাজনক, কোন্‌টা বিপদজনক —তারই হিসেব।

অন্যান্য দেশের আইনকর্তারা দর্শন নিয়ে কতটা মাথা ঘামিয়েছেন জানা নেই। তবে এটুকু কথা অনেকেরই জানা আছে যে মস্ত বড়ো দার্শনিকও যখন আইনকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যার হিসেবটা গৌণ হয়ে যায়। প্লেটোর (Plato) মতো দার্শনিকও তাই সাধারণ শ্রমজীবীদের ঠিকমতো শাসনে রাখার কৌশল হিসেবে তাঁর 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে "সুমঙ্গল মিথ্যার" (beneficial falsehood) বা "মহান অসত্যর" (noble lie) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কথাটা মিথ্যে বলে জেনেশুনেও রাজনীতির খাতিরে তা প্রচারের সুপারিশ করেছেন। এই কারণেই আইন প্রসঙ্গে রচিত তাঁর 'দি লস্' (The Laws) নামে শেষ ও চরম গ্রন্থে প্রাচীন মিশরের বস্তাপচা কুসংস্কারের দিকে ফিরে তাকাবার উপদেশ দিয়েছেন : উদ্দেশ্য এই যে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকলেও প্রোপাগানডা যথেষ্ট জোরদার হলেই সাধারণ মানুষকে অনেক কথাই গেলানো যায়। প্লেটোর সমসাময়িক রাজনীতিবিদ্ আইসোক্রেটিসও (Isocrates) একই কারণে প্রাচীন মিশরের কুসংস্কারের গুণমুগ্ধ : শ্রমিক-সাধারণের ঘাড়ে তার বোঝা চাপাতে পারলে ওদের মন কুঁজো হয়ে থাকবে, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সহজে মাথা তুলতে পারবে না। রোমান রাজনীতিবিদ পলিবিয়াসও (Polybius) ক্রীতদাসপ্রথার একটা বড়ো খুঁটি হিসেবে অন্ধ সংস্কারের গুণমুগ্ধ।

আমাদের দেশের আইনকর্তারা অবশ্য অমন সরাসরি মিথ্যে কথা বা অন্ধ সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করেন নি। কিন্তু দেশ-শাসনের ব্যাপারে দর্শনের অবাধ স্বাধীনতা তাঁদের কাছেও বিষবৎ। তবে প্রাচীন গ্রীস বা রোমের আইনকারদের সঙ্গে মূল তফাতটা এই যে, এদেশে একটা সংস্কারগত ধারণাকে ঠেকো দেবার প্রয়োজনে আর-একটা সংস্কারগত ধারণার

প্রচার। অর্থাৎ দেশ-শাসনের প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটা দার্শনিক মতই মানতে হবে এবং এ মতটাই চরম সত্যের পরিচায়ক। কেননা এটাই শাস্ত্রসংগত মত। পাছে নির্মল যুক্তিতর্কের বিচারে মতটার বিরুদ্ধে বেয়াড়া প্রশ্ন ওঠে, এই আশঙ্কায় আমাদের আইনকর্তারা আরও ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীন যুক্তিতর্কের বিচারটাই অচল, অতএব নিষিদ্ধ।

আইনকারদের বিধান। তাই লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থাও।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের আইনকারদের হস্তক্ষেপের কথাটা বাদ দিলে সাধারণভাবে ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির—এবং বিশেষ করে চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রায় অন্তহীন প্রোপাগানডার সম্যক্‌বোধ সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আলোচনায় তার অভাব বলেই আমরা এ বিষয়ে দু-চার কথা বলবো।

প্রথমত, সমাজ-আদর্শের কথা। আইনকর্তাদের বিচারে সমাজের গড়নটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, দার্শনিক আদর্শের কথা। আলোচ্য সমাজ-আদর্শের সংরক্ষণে কোন্ মত শ্রেয়, কোন্ মত হেয়।

তৃতীয়ত, আরো একটা কথা অবশ্যই বুঝতে হবে। বক্তব্যগুলো নিছক পুঁথির পাতায় আবদ্ধ থাকলে লাভ কী? সমাজব্যবস্থার খাতিরেই এতো কথা। তাই সাধারণ মানুষের মাথায় যে-করে-হোক ঢোকাতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে মস্ত বড়ো সমস্যা আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এতো দিন পরেও এবং রকমারি পরিকল্পনা নিয়ে খবরের কাগজে অনেক কিছু প্রকাশিত হলেও—বাস্তব ঘটনা এই যে দেশে নিরক্ষর মানুষের অনুপাতটা আজো ভয়াবহ। প্রাচীন ও মধ্য যুগের অবস্থাটা অনুমানের চেষ্টাও নিরর্থক। তবুও ভাবতে যতোই অবাক লাগুক না কেন, আইনকর্তাদের অভিপ্রেত দার্শনিক মতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অল্পবিস্তর পরিচয় বর্তমান। মায়া, ব্রহ্ম, অদৃষ্ট—এ-জাতীয় মতের ব্যাখ্যায় বড়োসড়ো বই আছে। কিন্তু সাধারণ কৃষকের মুখেও কথাগুলো শুনলে অবাক লাগে না। অতএব মানতেই হবে যে, তাদের মাথায় এসব কথা ঢোকাবার একটা কোনো ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ছিলো। তার কথা বাদ দিলে আমাদের আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে।

প্রধানত এই কথাগুলি আলোচনা করে আমাদের উপসংহারে পৌঁছবার চেষ্টা করবো।

রাজনীতি : আইনকর্তাদের সমাজ-আদর্শ

আইনকর্তাদের সমাজ-আদর্শটা একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সমাজে মোটের ওপর দুই শ্রেণীর মানুষ। আধুনিক পরিভাষায়, পরশ্রমজীবী এবং শ্রমজীবী, শোষক ও শোষিত। ধর্মশাস্ত্রকারদের পরিভাষায়, দ্বিজ ও শূদ্র। দ্বিজ কথাটার প্রাক্ ইতিহাস নিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা মাথা ঘামান। কিন্তু আইনকারদের বক্তব্য, যাদের উপনয়নাদি ব্যবস্থা তাঁরাই দ্বিজ, বাকি সব শূদ্র। উপনয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা কাদের? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর। বাকি সব শূদ্র। মনু বলেছেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন শ্রেণীর লোক দ্বিজ; চতুর্থ শ্রেণী বলতে শূদ্র। এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণী হিসেবে আর কিছু নেই।' (১০।৪)

আইনকর্তারা আরও বিধান দিয়েছেন, নেহাত বিপদ-আপদের অবস্থা ছাড়া প্রত্যক্ষ শ্রমের দায়িত্ব দ্বিজদের নয়; তারা কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত; সে দায় শুধু শূদ্রদের। অবশ্যই, সমাজে মোট লোকের তুলনায় ব্রাহ্মণাদি দ্বিজর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য। সংক্ষেপে, একদিকে সংখ্যালঘু পরশ্রমজীবী, অপরদিকে বিপুল শ্রমজীবী মানুষ—বিপুল কেননা পুরো সমাজের খাওয়াপরা থেকে সবরকম সুখসমৃদ্ধি-বিলাস-ব্যসনের সবটা ব্যবস্থা-ভার তাদের শ্রমের ওপর। এই শ্রমজীবী মানুষদের কর্তব্য

এবং জীবনধারণের মানও আইনকারেরা বেঁধে দিয়েছেন। মনু বলেছেন, শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য দ্বিজদের—বিশেষত অবশ্যই ব্রাহ্মণদের—সেবা; এ-ছাড়া তারা আর যা কিছু করুক না কেন সবই নিষ্ফল হবে (১০।১২৩)। কিন্তু তার জন্যও তো বাঁচতে হবে। নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু নিছক বাঁচবার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশি একটুও নয়: উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন এবং শোবার জন্য বড়ো-বড়ো ছেঁড়া কাঁথা (১০।১২৫)। অবশ্যই তাদের পক্ষে ধন অর্জন অসম্ভব নয়। কিন্তু মনু বলছেন,—'ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না; কেননা শূদ্র ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের বড়ো কষ্ট হয়' (১০।১২৯)।

তাহলে, পারিভাষিক শব্দ পৃথক হলেও, এক চরম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কথাই: একদিকে নিছক শ্রমজীবী, কিন্তু তাদেরই শ্রম-উৎপন্ন সামগ্রী থেকে নিছক বাঁচার খাতিরে যেটুকু দরকার শুধু সেটুকু-ই তার ভাগে; বাকিটা—যাকে আমরা বলি উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস—তার সবটাই কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত সুখ-সম্ভোগের কমবেশি অধিকারীদের। সভ্যতার শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত সারাটা ইতিহাস বলতে সব দেশে যেরকম, সেই রকমই।

দর্শন : ভাববাদের ভূমিকা

অবশ্য যুগের পর যুগ ধরে, সারা ইতিহাস জুড়ে, শ্রমিক-সাধারণ মুখ বুজে এহেন ব্যবস্থা যে মেনে নিয়েছে, তা কল্পনা করার কারণ নেই। বিদেশের কথা আপাতত না-হয় নাই তোলা গেল, কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারেরাই শূদ্র-অভ্যুত্থানের, এমনকি শূদ্রর পক্ষে রাষ্ট্রশক্তি দখলের সম্ভাবনা—অতএব আতঙ্কও—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করেছেন। (মনু ৪।৬১; ৮।২১-২২; ইত্যাদি)। য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের আগে পর্যন্ত শ্রমিক-অভ্যুত্থান কেন স্থায়ী সার্থকতা লাভ করে নি, তার বাস্তব কারণ মার্কসীয় সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিক-অভ্যুত্থানের বা ভারতীয় পরিভাষায় শূদ্র-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কতো রকম আয়োজন। বাহুবল ও অস্ত্রবল বা চলতি কথায় যাকে বলে পুলিসী ব্যবস্থা তার কথা তো মামুলি। কিন্তু তাছাড়াও আরও একরকম শক্তির প্রয়োজনও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, এবং এই শক্তি নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা। মতাদর্শগত শক্তি। দার্শনিক শক্তি। অবশ্যই এমন মতাদর্শ বা দর্শন—শ্রমিক-সাধারণকে তাঁবে রাখার পক্ষে যার ভূমিকা আছে।

দার্শনিক পরিভাষায় ভাববাদ। এবং তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্পর্কিত বিশ্বাসবাদ। ধর্মবিশ্বাস। শাস্ত্রবিশ্বাস। 'মেটরিয়ালিজম্ অ্যানড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে ভাববাদের সঙ্গে বিশ্বাসবাদের নাড়ির সম্পর্কে বারবার লেনিন উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারদের মন্তব্যেও ভাববাদের সঙ্গে বিশ্বাসবাদের সম্পর্ক সরাসরি স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি থেকে আলোচনা শুরু করা সুবিধের হবে। ভাষা ব্যবহারে তাঁর পটুত্বের পুনরুল্লেখ অবশ্যই বাচালতার মতো শোনাবে। কিন্তু কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, প্রখ্যাত ভাববাদীদের পরিভাষায় মালা গেঁথে একই কথা বলার দরকার বোধ করলে মূল কথাটা তিনিই অনায়াসে বলতে পারতেন। তার বদলে বলেছেন, যে দার্শনিক তত্ত্বের এক উড়োজাহাজ অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে ধ্যানধারণার এমন ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গেল যেখানে বাস্তব পৃথিবীর সত্তা অস্পষ্ট, তার অস্তিত্বের দাবি বিলয়ের মহাশূন্যে বিলীন—ধ্যানধারণার সেই ঊর্ধ্বলোকই দার্শনিকদের ভাষায় ভাববাদ। সেখান থেকে মারেই বা কে আর মরেই বা কে, খুদকুঁড়ো খেয়ে যারা কোনোমতে প্রাণধারণ করে তারাই বা কে, আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে সাজানো

যাদের খাবার থালা, তারাই বা কে! ছেঁড়া কাঁথায় যাদের শোবার বিধান তারাই বা কে, আর যাদের জন্য তুহু-ফেননিভ শয্যা তারাই বা কে! সবই মায়া, মিথ্যা; মরীচিকায় দেখা জলের মতো, স্বপ্নে দেখা প্রাসাদের মতো, দড়িতে দেখা সাপের মতো। অজ্ঞানের ঘোর। এসব নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলা, পাওনাগণ্ডার দাবি নিয়ে শোরগোল পাকানো—সবই নেহাত বেকুবের লক্ষণ। অন্তত পরম সত্য—বা যাকে ভাববাদীরা বলেন পারমার্থিক সত্য—তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিশ্চয়ই তাই। অথচ পারমার্থিক সত্যের সম্যক উপলব্ধি ছাড়া মোক্ষ অসম্ভব। এবং তার মানে ব্রহ্মজ্ঞান—বিশুদ্ধ আত্মাই চরম সত্য, এই তত্ত্বটি ঠিকমতো বুঝতে পারা।

অতএব ধর্মশাস্ত্রকারেরা—অর্থাৎ আমাদের দেশের আইনকারেরা—বার-বার বলছেন, তুচ্ছ মায়ার জগৎ নিয়ে মাতামাতি না করে উপনিষদে বর্ণিত পরব্রহ্মর কথাটা শ্রবণ করো, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, ধ্যান করো। শুধু "মনুস্মৃতি" থেকেই গোটাকতক নমুনা পর্যাপ্ত হবে: ৪।২৯-৩০; ৪।৪৯; ৪।৮২-৮৪; ১২।৮৩; ১২।৮৫; ১২।৯১-৯৩; ১২।১১৮-১২৫। আরো অনেক নজির দেখানো কঠিন নয়। কিন্তু দরকার নেই। এটুকু দেখতে-দেখতেই হাঁফ ধরে যাবে। কেবল মনে রাখতে হবে **"মনুস্মৃতি"** যেসেতেসে বই নয়; সাবেক কালের আইনশাস্ত্রর আকরগ্রন্থ। অগ্রাহ্য করলে শাস্তির বিধান আছে।

চার্বাক অবশ্য বলবেন, স্রেফ ধাপ্পাবাজি। রাজনীতির তাগিদে—বিশেষত শোষকশ্রেণীর চাহিদা মেটাবার জন্য—লোকঠকানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। এহেন উদ্ধত অবিশ্বাসের ফলে চার্বাকের কপালে যে ঠিক কতরকম শাস্তি জুটেছিলো, তার কথা আমাদের দেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। আন্দাজ করা হয়তো বা অসম্ভব নয়। তবে যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে তার থেকে হয়তো অনুমানের সুযোগ থাকে যে দেশে শাসনব্যবস্থা যাতে নিরাপদ হয় সেই উদ্দেশ্যে চার্বাকের বা লোকায়তিকের কথার বিরুদ্ধেহুঁশিয়ারিটা আইনগ্রন্থ ছাপিয়ে মহাকাব্যের মতো জনপ্রিয় সাহিত্যে পৌঁছেছিল।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড বর্ণনা করা হয়েছে, রামচন্দ্র যখন চিত্রকূটে অবস্থান করছেন তখন শোক-সন্তপ্ত ভরত তাঁর কাছে এলেন। রামচন্দ্র তাঁকে কোলে বসিয়ে আদরটাদর করে বিশেষত রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে নানা উপদেশ দেন। সেই উপদেশপ্রসঙ্গেই বলেন, হে বৎস, আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছো না। ওরা অনর্থ বাধাতে ওস্তাদ, এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে আস্ফালন করলেও আসলে বালকের মতো মূর্খ। প্রধান-প্রধান ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যুক্তিতর্কমূলক দুর্বুদ্ধির দোহাই দিয়ে অর্থহীন কথা প্রচার :

> কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
> অনর্থকুশলা হেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
> ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
> বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে॥
>
> অযোধ্যা (১০০।৯৮-৯)

উপদেশটা রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে বলেই রাজনীতির সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কটা সাদামাটা পাঠকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রচারমাধ্যম বা ম্যাস মিডিয়া হিসেবে "রামায়ণে"র গুরুত্বটাও মনে রাখা দরকার: নিরক্ষর দেশবাসীও কথক ঠাকুরের মুখে "রামায়ণে"র উপদেশ শুনে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু প্রচার-মাধ্যমের কথা একটু পরে আরো বিশদভাবে আলোচনার চেষ্টা করবো। আপাতত আর-একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। লোকায়তিকের দুর্বুদ্ধিটা আসলে কী? মহান ধর্মশাস্ত্র (বা আমাদের সাবেকি আইনগ্রন্থ) থাকা সত্ত্বেও ওরা যুক্তিবিচার বা তর্কবিচার আশ্রয় গ্রহণ করে। কথা-গুলো আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ প্রাসঙ্গিক। যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারে আইনগ্রন্থগুলি এমন মুখর—তুচ্ছ পার্থিব বিষয় অগ্রাহ্য করে যে

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে একেবারে সরাসরি মোক্ষলাভের প্রলোভন—তার আসল খুঁটি কী বুঝতে হবে? আইনকারদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব আছে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা—শাস্ত্র বলতে শুধুমাত্র বেদ-উপনিষদ্ নামের "শ্রুতি" নয়; ধর্মশাস্ত্র বলে "স্মৃতি"-ও। সোজা কথায়, শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অন্তত আমাদের দেশের চরম ভাববাদীদের কথাটাও এই-ই। কিন্তু তাঁদের আরো একটু বোধ আছে। এই শাস্ত্র-বিশ্বাস আর যাই হোক, যুক্তিতর্কের ধোপে টেঁকে না। কিংবা যা একই কথা, শাস্ত্রবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি-বিচার যাকে বলে অহিনকুল-সম্পর্ক। তাই স্বয়ং রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, মহান ধর্ম-শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও লোকায়তিকদের এমনই দুর্মতি যে তারা যুক্তিতর্কের অবলম্বন খোঁজে।

শাস্ত্রবিশ্বাস বনাম যুক্তিবিদ্যা

মনু বিধান দিয়েছেন, 'বেদকে শ্রুতি এবং ধর্মশাস্ত্রকে "স্মৃতি" বলে মানবে। এই দুই হলো সর্বধর্মের মূল। ঐ নিয়ে কোনো তর্কাতর্কি চলবে না। হেতুশাস্ত্র (অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, বা সোজা কথায় থাকে বলে লজিক) অবলম্বন করে কোনো দ্বিজ যদি শ্রুতি-স্মৃতির অবমাননা করে তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে একেবারে দূর করে দেবেন। বেদনিন্দকেরা নাস্তিক।' (২।১০-১১)

সহজেই বোঝা যায়, আইনকর্তাটি যে শাসন কায়েম করতে চান তার প্রধান শর্ত হলো অবিচল শাস্ত্রবিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস বিস্মিত হবার একটা আশঙ্কাও আছে। কিসের আশঙ্কা? হেতুশাস্ত্র বা তর্কবিদ্যার। হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করতে গেলে এমনকি খোদ দ্বিজরও রক্ষা নেই। সমাজ থেকে তাকে বের করে দিতে হবে।

আরো বিধান আছে। মনু বলছেন, 'পাষণ্ডদের, নিষিদ্ধবৃত্তি-অবলম্বনকারীদের, ভণ্ডদের, শঠদের, তার্কিকদের, দাম্ভিকদের—এদের কারো সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করবে না।' (৪।৩০)। কি তার্কিকদের বিরুদ্ধে এমন সব কড়া আইন কেন? ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার কুল্লুকভট্টর লেখা থেকে মনে হয়, তর্কবিদ্যার একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই নাস্তিক্যের দিকে। ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। মেধাতিথি বলছেন, 'হৈতুকাঃ নাস্তিকাঃ, নাস্তি পরলোকা, নাস্তি দত্তং, নাস্তি হুতম্ ইত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ'—হৈতুক মানেই নাস্তিক, তাদের স্থির বিশ্বাস পরলোক দান হোম প্রভৃতি অর্থহীন। কুল্লুকভট্ট বলছেন, 'হৈতুকা বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ'—যারা বেদবিরোধী তর্ক করে তারাই হেতুশাস্ত্রপরায়ণ বা তার্কিক। অবশ্য যাঁরা বেদ মেনে তর্ক করেন বা শাস্ত্রের প্রামাণ্য আরো দৃঢ় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা করতে চান—তাঁদের বিরুদ্ধে আইনকর্তাটির তেমন আপত্তি নেই। কিন্তু আপাতত কথা হলো, শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্কের কথা, শুধু তর্কের কথা, মোহমুক্ত যুক্তিবিদ্যার কথা। এ তর্ক বড়ো সাংঘাতিক। তা আইনকর্তার আদর্শ সমাজটার ভিত টলিয়ে দিতে চায়। কেননা, একদল শুধু খেটে মরবে, আর একদল তাদের খাটুনির ফল ভোগ করবে—এহেন সমাজ মেনে নিতে গেলে শাস্ত্রে অটল আস্থা থাকা দরকার। মনু বলছেন, শাস্ত্রে আছে যে নিছক দাসত্ববৃত্তি জন্মেই স্বয়ং ভগবান শূদ্রদের সৃষ্টি করে-ছিলেন। (মনু ১।৯১; ৮।৪১৩-৪১৪)

প্রচার-মাধ্যম

তাহলে দ্বিজ-শূদ্রে বিভক্ত এই সমাজাদর্শের ভিত বলতে অটল শাস্ত্রবিশ্বাস। মোহমুক্ত তর্কবিদ্যার প্রবণতাই হলো সে-বিশ্বাসে ফাটল ধরানো, কিংবা আইনকর্তাদের ভাষায় যা একই কথা, নাস্তিকতা। যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে তাই অমন হুঁশিয়ারি। এমনকি আইন জারি।

কিন্তু সমস্যা আছে। আইনকারদেরই সৃষ্ট সমস্যা। কথাগুলো কার—বা কাদের—মাথায় ঢোকানোর

তাগিদ সবচেয়ে বেশি? নিশ্চয়ই এমন শ্রেণীর লোকের মাথায় যারা নিঃসম্বল হয়েও মুখ বুজে খেটে মরতে রাজি হবে। কিন্তু কী করে তা ঢোকানো যায়? শিক্ষাদীক্ষার সামান্যতম সুযোগ থেকেও তো তারা বঞ্চিত। শুধু তাই নয়। ধর্মশাস্ত্রকারেরাই আর এক হাঙ্গামা বাধিয়ে রেখেছেন। কথাগুলোয় যাতে কোনোরকম সংশয়ের অবকাশ না থাকে, তাই তাঁরা ঘোষণা করে রেখেছেন, তাঁদের আইনগ্রন্থরূপ শাস্ত্রের মর্যাদা আছে। শ্রুতি না হলেও অন্তত স্মৃতি। কিন্তু তাঁদেরই আর-এক ঘোষণা অনুসারে স্ত্রী-শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নেই। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভাষায় যারা শূদ্র তারা কী করে বুঝবে যে মোহমুক্ত তর্কটা একটা মহাপাপ, অধঃপাতে যাবার পথ?

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই কঠিন সমস্যার এক আশ্চর্য সরল সমাধান চোখে পড়ে। সমাধানটা এসেছে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে। শাস্ত্র পড়তে শূদ্রের বাধা আছে, কিন্তু মহাকাব্য বা পুরাণ শুনতে বাধা নেই। তাহলে এরই মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রকারদের বিধানগুলো কোনোমতে শূদ্রর মাথায় পুরে দিতে পারলেই হলো। এবং তারই ব্যবস্থা হয়েছিলো। মহাকাব্য ও পুরাণের আদিরূপ কী ছিল, কতো লোকের হাত ঘুরে কত অংশ সংযোজিত হয়ে এগুলি পরবর্তী কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে—তা নিয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং করছেন। আমাদের আলোচনায় শুধু একটা নজিরই পর্যাপ্ত হবে। শুধু মহাভারতের মধ্যেই 'মনুস্মৃতি' প্রভৃতি প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রর কত শ্লোকের প্রায় হুবহু পুনরুক্তি চোখে পড়ে, ব্যয়েলার (Buhler) তার একটা ফর্দ তৈরি করেছেন। শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না করেও এই তালিকায় শুধু সাঁটে গ্রন্থনির্দেশ এবং তালিকাটা ছাপাতে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার উপর দরকার হয়েছে। এ-ছাড়াও পি. ভি. কানে-রচিত সুবিশাল "ধর্মশাস্ত্রর ইতিহাস" তো হাতের কাছেই রয়েছে। তার পাতা ওলটালেই দেখবেন অধুনালভ্য মহাকাব্যেও ধর্মশাস্ত্রর বিধানের কীরকম ছড়াছড়ি!

কথাগুলো মনে রেখে দেশের বাস্তব পরিস্থিতিটার কথা ভাবতে হবে। বঞ্চিত ও নিরক্ষর গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র না-হলেও অন্তত একটা প্রধান ব্যবস্থা কথকতা। মহাকাব্য পুরাণ প্রভৃতির ব্যাখ্যামূলক আবৃত্তি। কথকঠাকুরদের কৌশলের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই জানে, আশ্চর্য সহজ সরল ভাষায় নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে কত মনোরমভাবে নানা দার্শনিক সমস্যারও ব্যাখ্যা করার তাঁদের কী অসামান্য দক্ষতা! মহাকাব্য ও পুরাণের আখ্যানভাগে আকৃষ্ট হয়ে লোক জড়ো হবে; তাই নেহাত চাষাভুষোদেরও নির্দ্বিচারে এ-জাতীয় দার্শনিক মতামত গেলাবার ব্যবস্থা। সাবেক কালের প্রচার-মাধ্যম বলতে প্রধানত এই কথকতা।

যুক্তিতর্কের আতঙ্ক

মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে একটা উপাখ্যান দেখা যাক। মনে রাখবেন, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কাছে কথকঠাকুর নিপুণভাবে গল্পটা ব্যাখ্যা করছেন।

এক যে ছিল শেয়াল। আসলে কিন্তু শেয়াল নয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র শেয়ালের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। কিন্তু কেন? কেননা পৃথিবীতে এক মহা অঘটন ঘটে-ঘটে বলে! এক খোদ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করে বসেন বুঝি! এহেন সর্বনেশে সম্ভাবনা ঠেকাবার জন্যেই ইন্দ্রর ওই ছদ্মবেশ। কিন্তু ব্রাহ্মণের মাথাতেই বা আত্মহত্যার কথা ঢুকলো কেন? আর তা রোধ করবার জন্যে শেয়ালের ছদ্মবেশই বা দরকার পড়লো কেন?

সে অনেক কথা। এক ধনী ব্যাবসাদার রথে চড়ে যাবার সময় ব্রাহ্মণটিকে ধাক্কা মেরেছিল। কিন্তু লোকটার টাকার জোর এমনই প্রবল যে, ব্রাহ্মণ দেখলেনএহেন কঠিন অপরাধেরও কোনো প্রতিকার নেই। অতএব বেঁচে থেকে আর লাভ কী? তাই

আত্মহত্যার সংকল্প।

দেবরাজ ইন্দ্র বুঝলেন, এ তো নেহাতই সর্বনেশে ব্যাপার। একেবারে খোদ ব্রাহ্মণ সত্যিই আত্মহত্যা করে না বসেন। যে করে হোক, তা বন্ধ করতে হবে। তাই শেয়াল সেজে ব্রাহ্মণটির সামনে উপস্থিত।

কিন্তু শেয়াল কেন? কেননা ইন্দ্র ভাবলেন, এহেন একটা নীচু ধরনের জানোয়ার সাজতে পারলে পশুজন্মের তুলনায় মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বেশ ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। ইন্দ্র করলেনও তাই। ব্রাহ্মণের সামনে শেয়াল সেজে আবির্ভূত হয়ে প্রথম টায় এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তার সারমর্ম মানুষের তুলনায় নীচ জন্তুজানোয়ারের কতো কষ্ট, কতো দুঃখ। যেমন মানুষের হাত আছে, পশুর নেই। তাই পিঠে একটা পোকা কামড়াতে শুরু করলেও পশুবেচারার পক্ষে তার যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর উপায় কী? হাত থাকলে পোকাটাকে অনায়াসেই ফেলে দেওয়া যেত। এইভাবে অনেক রকম দুর্ভোগের নজির দিয়ে মানবহস্তের গুণগান। বস্তুত শেয়ালটি বোঝালো যে, মানুষের হাত আছে বলেই পুরো জীবজগতে মানুষের এমন প্রতাপ; বাকি জন্তুজানোয়ার তো শুধু মুখ বুজে মানুষের দাসত্ব করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? মানবহস্তের এত গুণগান কেন? আসলে ওই শেয়ালরূপী ইন্দ্রের পক্ষে এসবই ভণিতা মাত্র। তাঁর আসল বক্তব্যটা ধাপে-ধাপে বোঝাবার একটা আয়োজন। প্রথম ধাপে বাকি জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তুলনামূলক সুখ-সুবিধার কথা। দ্বিতীয় ধাপে মোদ্দা কথাটা হলো, মনুষ্যজন্মই বলো বা পশুজন্মই বলো—কোনোটাই অকারণ নয়। অনেক জন্মের সঞ্চিত পুণ্যের ফলে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যজন্ম—জন্মজন্মান্তরের পাপের ফলেই শেষ পর্যন্ত পশুজন্ম। তাই এহেন মহামূল্য মনুষ্যজন্ম, তাও আবার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজন্ম—সাধ করে কেউ ধ্বংস করবে নাকি? ব্রাহ্মণটির পক্ষে আত্মহত্যা করবার পরিকল্পনাটা প্রচণ্ড অভিমানের পরিচায়ক হলেও সুবুদ্ধির পরিচায়ক মোটেই নয়।

গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারত, কেননা মনুষ্যজন্মের—বিশেষত মানবজন্মের মহত্ত্ব অতো সুদীর্ঘভাবে শুনে ব্রাহ্মণটির পক্ষে আত্মহত্যা করবার আর কোনো উৎসাহ থাকবার কথা নয়। কিন্তু মহাভারতের আলোচ্য উপাখ্যানটি যিনিই রচনা করে থাকুন না কেন, উপাখ্যানটা এখানে শেষ হলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হবার সম্ভাবনা। তাই এ পর্যন্তও ভণিতা এবং অমন সুদীর্ঘ ভণিতার পরেই আসল কথাটা পাড়বার আয়োজন।

আমাদের শেয়ালটি বলছে, শেয়াল হিসেবে—নীচ জানোয়ার হিসেবে—তার আজ এতো যে যন্ত্রণা তারও একটা কারণ আছে। এবং এই কারণটাই হলো পুরো উপাখ্যানের আসল মর্মকথা। কী কথা?

শেয়ালটি আসলে চিরকালই শেয়াল ছিল না। গতবার তো পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হিসেবেই তাঁর জন্ম। কিন্তু নেহাত মূঢ়ের মতো সে জন্মে ব্রাহ্মণটি এক মহাপাতক করেছিলেন, এবং তারই ফলে আজ তাঁর এই অবস্থা—নীচ জানোয়ার হয়ে জন্ম।

কিন্তু কী সেই মহাপাতক? শ্রোতারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সিধে হয়ে বসেছেন, কান খাড়া করে শুনছেন! এবং অতো ভনিতার পরে শেয়ালও ওই মহাপাতকের বর্ণনা শুরু করছে:

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অধ্যবক্তো নিরর্থকাম্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রহ্মবাকেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্য ইয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥
(শান্তিপর্ব, ১৮০।৪৭-৪৯)।

আমি ছিলাম বেদনিন্দক যুক্তিবাদী পণ্ডিত। নিরর্থক আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যায় তখন আমি অনুরক্ত। বিচার-সভায় যুক্তিবাদের প্রবক্তা ছিলাম, যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে ছিলো আমার আক্রোশ।

পাণ্ডিত্যাভিমান সত্ত্বেও আমি ছিলাম মূর্খ; সব-বিষয়েই সংশয়গ্রস্ত, নাস্তিক। অতএব, হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আজ আমার এরকম শেয়াল হয়ে জন্ম।

কথকঠাকুরের মুখে কথাগুলোর ফলাও ব্যাখ্যা শুনেও আজ আপনার যদি তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হবার মতো বুকের পাটা থাকে তাহলে থাকুক; কিন্তু মনে রাখবেন সেই পাপে পরজন্মে আপনাকে শেয়াল হয়ে জন্মাতে হবে, পিঠে পোকামাকড় কামড়ালেও তা হাত দিয়ে তুলে ফেলতে পারবেন না।

প্রোপাগানডা। সন্দেহ নেই। কেননা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা অবান্তর হবে না যে আমাদের দেশের প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকেরা যুক্তিবিদ্যার অসারতা প্রমাণ করার জন্যে রাশি-রাশি বই লিখেছেন। নাগার্জুনের "প্রমাণ বিধ্বংস" থেকে শ্রীহর্ষর "খণ্ডন খণ্ডন খাদ্য" পর্যন্ত তার অনেক নজির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এইসব বই পড়া এবং পড়ে বোঝা চারটিখানা কথা নয়। বিস্তর বিদ্যেবুদ্ধির দরকার। কিন্তু মহাভারতে যিনি আলোচ্য উপাখ্যানটি রচনা করেছেন, তাঁর কৌশলটা একেবারে আলাদা। তারিফ করতে শুরু করলে শেষ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। চাষা-ভুষোদের সামান্যতম অক্ষর-পরিচয়ের সুযোগ দিতে হলো না। তবুও তর্কবিদ্যা ও তারই সিদ্ধান্ত নাস্তিক্য-বুদ্ধির বিভীষিকাটা কত অনায়াসেকীর, কম জমজমাট একটা গল্প ফেঁদে—কথকঠাকুর মারফত তাদেরই চেতনায় গেঁথে দেবার আয়োজন করা গেলো। আজকের দিনে এরকম কুশলী প্রোপাগানডিস্টের খবর পেলে শাসক সম্প্রদায় পুরস্কারের ঝুড়ি উজাড় করে দেবেন!

যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তিপণ

আর শুধু একটি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বলে এই আলোচনা শেষ করবো। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটা প্রধান গৌরব বলতে কিন্তু তর্কবিদ্যাই। প্রচলিত নাম ন্যায়দর্শন। দেশের আইনকর্তারা যদি তর্কবিদ্যার বিরুদ্ধে অতো বিষোদগার করে থাকেন, তাহলে ন্যায়-দর্শনের বিকাশ হলো কী করে?

উত্তরটা বোঝার আগে আইনকর্তাদের আসল মনোভাবটা আরো একটু খতিয়ে বুঝতে হবে। তর্ক-বিদ্যা নিয়ে তাঁদের এতো যে আতঙ্ক তার কারণ এই বিদ্যা শাস্ত্রবিশ্বাসের প্রতিকূল এবং দেশের সাধারণ মানুষকে তাঁবে রাখবার পক্ষে শাস্ত্রবিশ্বাস বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তর্কবিদ্যাই যদি শাস্ত্রবিশ্বাসের উমেদারি করতে রাজি হয়? তাহলে অবশ্য আইন-কর্তাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। ছিলোও না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। নাস্তিক্য ঘুচবে, অথচ তর্কবিদ্যাকে অমন স্থূলভাবে আক্রমণ করতে হবে না। তাই স্বয়ং মনু 'বেদের অববিরোধী' তর্ক-বিদ্যার প্রশংসাই করেছেন (১০।১০৫-৬)। তাঁর অপর একটি এ জাতীয় উক্তি (৭।৪৩) প্রসঙ্গে মেধাতিথি কথাটার কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, আইনকর্তাদের কথাটা এই যে, বেদের বা শাস্ত্রের প্রামাণ্য শিরোধার্য করে তর্ক করতে চাও তো করো। তাতে তো ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে সুবিধেই।

অনুমান হয়, ধর্মশাস্ত্রকারদের এ-জাতীয় একটা মনোভাবের ফাটল দিয়েই ন্যায়শাস্ত্র অন্তত আদি পর্যায়ে তর্কবিদ্যা হওয়া সত্ত্বেও সমাজে স্বীকৃতি খুঁজে-ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদের আসল মনোভাবটা তাঁদেরই রচনায় এদিক-ওদিক থেকে যেন উঁকিঝুঁকি মেরেছে। সেটা খুব একটা শাস্ত্রীয় মনোভাব কিনা, তা বিচার করার দরকার আছে।

ন্যায়সূত্রতে জোর গলায় বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মোট বারোটি সূত্র: ২।১।৫৭—৬৮। এর মধ্যে প্রথম ছটি পূর্বপক্ষ—অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে যুক্তি। পরের ছটিতে সে যুক্তি খণ্ডন করে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে প্রধান যুক্তিটার বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে

পর্যাপ্ত। বিপক্ষদল বলবেন, বেদ অনৃতদোষে দুষ্ট। সোজা কথায়, বেদের বক্তব্যে ভুল আছে। কী ভুল? পূর্বপক্ষবাদীর মতে, বেদে বলা হয়েছে পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে। অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ করলে পুত্রলাভ হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করলেও ছেলে হয় না। তাহলে তো বেদের কথাটা ভুল বা মিথ্যে। অনেকেই পুত্রকাম যজ্ঞ করেও পুত্র-লাভ করেন নি।

ন্যায়সূত্রে গৌতম এবং ভাষ্যে বাৎস্যায়ন রীতিমতো জোর গলায় এহেন আপত্তির উত্তর দিতে চেয়েছেন, বা উত্তর দেবার একটা যেন খুব তোড়জোড় করছেন। কিন্তু এই তোড়জোড়ের পরিভাষা ছেড়ে সাদামাটা কথায় উত্তরটা ঠিক কী? পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে ছেলে যে হবেই—এমনতরো দাবি অবশ্যই ওঁরা করছেন না। তার মানে, ওই যজ্ঞ করা সত্ত্বেও ছেলে হয়তো হয় না। কারণ আছে। কী রকম কারণ? নানারকম হতে পারে। বিপরীতবিহারজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের আত্মিক মিলনের দোষ। কিংবা হয়তা আয়ুর্বেদে আলোচিত কোনো স্ত্রীরোগ। কিংবা হয়তো পুরুষের নির্বীর্যতা। তাই দোষটা যজ্ঞের বা যজ্ঞবিধায়ক বেদের নয়। যজ্ঞবিধিটি অনৃতদোষ বা মিথ্যাত্বের অভিযোগ থেকে মুক্ত।

অবাক না লেগে উপায় কী? পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সমর্থন, না, সেইরকম কোনো সমর্থনের একটা যা-হোক তা-হোক মুখোশ পরিয়ে প্রকৃত যুক্তিবিচার এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের সমর্থন? সুস্থ বা প্রজননক্ষম নরনারীর স্বাভাবিক মিলন থেকে যে ছেলেপুলে হয়—এ বিষয়ে তো সূত্রকার এবং ভাষ্যকারের শতসহস্র নজির জানা থাকবার কথা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেও তা হয়, না করলেও হয়। তাহলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সংক্রান্ত বেদবিধির সমর্থনটা কোথায়? পড়তে-পড়তে বরং উলটো সন্দেহই জাগে। বেদের সমর্থনে বহু বাগাড়ম্বর মুখোশ পরানো যুক্তিবিচার ও বিজ্ঞানেরই সমর্থন। যদি তাই-ই হয় তাহলে তো বেদবিশ্বাসের সমর্থন করতে গিয়ে একরকম প্রচ্ছন্ন পরিহাসই। এহেন প্রচ্ছন্ন পরিহাস হিসেবেই কি বাৎস্যায়ন ছোট্ট করে বলে রেখেছেন লৌকিক বাক্যর সঙ্গে বেদবাক্যর আসলে কোনো তফাত নেই (৪।১।৫৯ ভাষ্য)। যদি তাই-ই হয়, তাহলে বেদের প্রামাণ্য নিয়ে অতো বাগাড়ম্বর কেন? আইনকর্তাদের চোখে এরকম ধুলো দিয়ে প্রকৃত তর্ক-বিদ্যারই সংরক্ষণ। ধর্মশাস্ত্রকারদের কাছে একরকম মুক্তিপণ দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যার নিরাপত্তি সৃষ্টি?

বেদপন্থীদের—বিশেষত যাজ্ঞিকদের—পরিভাষা ব্যবহার করে অনেক বাক্‌বিস্তার করা সত্ত্বেও পুত্রেষ্টি প্রসঙ্গে 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়নভাষ্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যে আলোচনা তা থেকে অবশ্যই সন্দেহ হয় ন্যায়-দর্শনের আদিরূপটিতে বেদ-ভক্তিটা আসলে ঐরকমই কিছু। ন্যায়দর্শনের আদি প্রবক্তাদের কাছে প্রামাণ্যর প্রকৃত নিদর্শন বলতে লৌকিক বিজ্ঞান—বিশেষত আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞান। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেও পুত্রলাভের যে অভাব তার আসল কারণ পুরুষরোগ বা স্ত্রীরোগ বা স্ত্রীপুরুষের মিলনের দোষ। কিন্তু এসব কথা তো আয়ুর্বেদেরই আলোচ্য বিষয়। তাহলে, মুখে যাই বলা যাক না কেন, প্রামাণ্য বলতে আসলে আয়ুর্বেদ, বেদ নয়। বেদ-প্রামাণ্যের চরম যুক্তি হিসেবে 'ন্যায়সূত্র'কার যা বলেছেন তা থেকেও এরকমই একটা সন্দেহ আরো জোরদার হয়। তাঁর বক্তব্য: "মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্যের মতোই আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।" (২।১।৬৮) ভাষ্যকার মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে "মন্ত্র" শব্দটির মানে বেদমন্ত্র নয়: "বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্থ, অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি যাহাদিগের প্রয়োজন, এমন মন্ত্র।" (তর্জমা: ফণিভূষণ)। সোজা কথায়, সাপের বিষ নামানো প্রভৃতি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র। গ্রামাঞ্চলে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে আজো অল্পবিস্তর তা চালু আছে। ওঝাদের মন্ত্র; বেদমন্ত্র নয়। অবশ্য এক অর্থে ওঝারাও চিকিৎসাবিদ—গ্রাম্য চিকিৎসাবিদ,

আয়ুর্বেদেরই হয়তো আদিম সংস্করণ। কিন্তু তা যাই হোক না কেন, সূত্রকারদের আসল বক্তব্য কী দাঁড়ায়? লোকপ্রচলিত ঝাড়ফুকের মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ অবশ্যই প্রমাণ বলে মানতে হবে। এবং যে শর্তগুলি মানার ফলে এ-জাতীয় মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য সেই শর্তগুলি মানে বলে বেদেরও প্রামাণ্য। তাহলে চলতি কথায় যাকে বলে মডেল (model) বা আদর্শ, তা ওই আয়ুর্বেদই। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য অবিসংবাদিত। তারই মূল শর্তগুলি বেদেও স্বীকৃত এবং এই কারণে বেদও প্রমাণ।

এই কি প্রকৃত বেদবিশ্বাস? নাকি, বেদবিশ্বাসের প্রতি কোনো একরকম নেহাতই মৌখিক আনুগত্য দেখিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যাকে আইনকর্তাদের বিধি-নিষেধ থেকে বাঁচাবার আয়োজন? বেদকে সত্যিই প্রমাণ বলে মানতে গেলে তাকে অপৌরুষেয় এবং স্বতঃঅভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। 'ন্যায়-সূত্র'কার ও বাৎস্যায়ন তার ধারকাছ দিয়েও যান নি। বাৎস্যায়ন তো সরাসরি বলেছেন, "ন ভিন্ততে চ লৌকিকাৎ বাক্যাৎ বৈদিকং বাক্যং প্রেক্ষপূর্বকারি-পুরুষ-প্রণীতত্বেন" (ন্যায়ভাষ্য, ৪।১।৫৯)। ফণিভূষণ তর্কজা করেছেন: "পরন্তু প্রেক্ষাপূর্বকারী অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিপূর্বক বাক্য রচনাকারী পুরুষের প্রণীতত্ব-বশতঃ লৌকিক বাক্য হইতে বৈদিক বাক্য ভিন্ন অর্থাৎ বিজাতীয় নয়।" সরল ভাষায়, লৌকিক বাক্যও যে-কারণে প্রমাণ, বৈদিক বাক্যও সেই কারণে প্রমাণ।

তাহলে, সংক্ষেপে বেদের প্রামাণ্য নিয়ে ন্যায়-দর্শনের আদিরূপটিতে অতো আফালন মোটের উপর একরকম মুক্তিপণ বা ransom দিয়ে তর্কবিদ্যাকে কোনোমতে বাঁচানো।

কিন্তু এইভাবে তর্কবিদ্যাকে বাঁচাবার ছুটো দিক আছে। সে বিষয়ে অন্তত দু-একটা কথা বলা দরকার।

প্রথমত, অনুমান হয়, এভাবে কোনোমতে যুক্তি-বিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করলে নৈয়ায়িকদের তর্ক-বিদ্যাও আইনকর্তাদের রোষানল থেকে রেহাই পেতো না। আর তা না পেলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য নিশ্চয়ই তুলনায় অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতো, কেননা ভারতীয় দর্শনের বিকাশে নৈয়ায়িকদের তর্কবিদ্যার অবদান অবিসংবাদিত। দ্বিতীয়ত, কিন্তু এভাবে ন্যায়দর্শনকে বাঁচাবার একটা বিপদও ছিল। দর্শনটির আদি প্রবক্তারা যে উদ্দেশ্যেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করুন না কেন, কালক্রমে—কয়েক শতকের মধ্যে—ন্যায়সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওই বেদবিশ্বাস এক স্বকীয় শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দেয়। পরবর্তী নৈয়ায়িকদের মধ্যে তার একটা চরম প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে। উদয়নাচার্যের মতো প্রখর তার্কিকও পরমাণুবাদের সমর্থনে বেদের সাক্ষ্য খোঁজেন এবং দাবি করেন পরমাণুগুলি গতিশীল এবং বেদের গতিসূচক 'পতত্র' শব্দ থেকেই প্রমাণ হয় যে বেদে পরমাণুবাদের সমর্থন আছে। 'পতত্র' শব্দের সাদা মানে কিন্তু পাখির ডানা—পতন থেকে যা ত্রাণ করে। এবং সারা বেদ চুঁড়েও পরমাণুবাদের আর কোনো নিদর্শন নেই, যদিও 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ'-এ উদ্দালক আরুণির উপদেশে পরমাণুবাদের কোনো একরকম আভাস পাওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু উদ্দালক নিজে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেই এই আভাস খুঁজেছিলেন, কোনো বৈদিক ঋষির আপ্ত-বাক্যের নজির থেকে নয়। অবশ্যই উদয়নের উক্তি সকলে মানে নি এবং উদ্দালকের উপদেশটির প্রকৃত তাৎপর্য নিয়েও অনেক তর্ক উঠবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেদের প্রামাণ্যর কথা নৈয়ায়িকদের মধ্যে চালু থাকতে-থাকতে একরকম আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো—একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। ধর্মশাস্ত্রকারেরা কেন তর্কবিদ্যার বিরুদ্ধে অমন প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁদের আসল মাথাব্যথা তো রাজনীতি নিয়ে, তাঁদের আদর্শ সমাজব্যবস্থা যাতে কোনোমতে শঙ্কিত না-হয় তাই নিয়ে। চলতি কথায় যাকে বলে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা—তারই সংরক্ষণ। তার মতাদর্শগত ভিত্তি বলতে পুনর্জন্ম, কর্মফল ইত্যাদি। এসব কথা যুক্তির ধোপে টেঁকে না বলেই যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ। অর্থাৎ বিধিনিষেধগুলোর মূল তাৎপর্য রাজনৈতিক। দার্শনিক নয়। কিন্তু শুধু দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টায় আদি ন্যায়দর্শনের গুরুত্ব যতোই হোক না কেন, এই রাজনীতির দিকটি সম্বন্ধে তা মোটের উপর উদাসীন। বরং 'ন্যায়সূত্র' থেকেই মনে হয় পুনর্জন্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলির বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের বিশেষ কোনো আপত্তি ছিলো না। বরং একটা সহিষ্ণুতাই ছিলো। 'ন্যায়সূত্র'-এ প্রেত্য-ভাব বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রকরণ আছে (৪।১।১০-১৩); 'অদৃষ্ট' প্রসঙ্গে প্রকরণ আছে (৩।২।৬০—৩।২।৭২) এবং এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করবার কোনো যুক্তি কেউ দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। বরং সূত্রকার ও ভাষ্যকার এগুলিকে নাস্তিক্য-নিরসনের আলোচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় আলোচনা আইনকর্তাদের কাছে অবশ্যই আদরণীয়। তাই আইনকর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যার সংরক্ষণ এক অর্থে বৈপ্লবিক চেতনার পরিচায়ক হলেও ন্যায়দর্শনকে অন্তত আধুনিক অর্থে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই।

আজকের দিনে অন্তত শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে দর্শনের মূল উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্নটা প্রাধান্য পাচ্ছে। শুধু তত্ত্বান্বেষণ, না সমাজপরিবর্তন? পৃথিবীর অন্তত বিরাট একটা অংশে দ্বিতীয় উত্তরটাই স্বীকৃত। সেদিক থেকে চার্বাকরা ধর্মশাস্ত্রকারদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোমতে তর্কবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন আর নাই করুন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই উন্নত পর্যায়ে আনার দিন যেন ঘনিয়ে আসছে। কেননা, সমগ্র ভারতীয় দর্শনে একমাত্র তাঁরাই সেকালের শোষণ-ভিত্তিক সমাজের মূল মতাদর্শের উপর প্রবল আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।

অবশ্যই আইনকর্তাদের বিধান ছিলো, ভদ্রসমাজ থেকে এদের একেবারে দূর করে দিতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে এ-বিধান কতোটা কাজে লাগানো হয়েছিলো, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করুন। আমাদের কথা শুধু একটাই। ভদ্রসমাজের বাইরে আজো আমরা আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি নানা নামে যে-সব 'দেহতত্ত্বে'র গান শুনি তার মধ্যে প্রাচীন চার্বাক-লোকায়তিকের মূল কথা কোনোভাবে টেঁকে আছে কিনা—তা নিয়েও গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন বেড়ে চলেছে। এরা বর্ণাশ্রমব্যবস্থা মানে না, দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু মানে না, কৃষকদের কানে যে-গান পৌঁছে দিতে চায় তার একটা বড়ো কথা হলো :

"নিজের চোখে দেখতে চাই।"

হে ঈশ্বর কত লাশ !

সমর সেন

একদা বেজায় ক্ষমতা ছিল আমার নেতার !
চোখের পলকে তাঁর
সিংহরাজ মাথা নিচু করে
পাতাত মিতালি ছাগের সঙ্গে।
আজ দেবতা আমার বোবা আর কালা,
নেড়া বটগাছের তলায়
ফোকলা হাসিতে আপনমনে সময় কাটান
নির্বিকার।

হে ঈশ্বর
কত লাশ !

কোথায় আদিগন্ত নদী,
আরক্ত সূর্যাস্ত জলে আর আকাশে,
পালে হাওয়ার উদ্দাম আবেগ
বাঙ্গাল যৌবনের গান !

হে ঈশ্বর
কত লাশ !

"চতুরঙ্গ" শ্রাবণ ১৩৭২ সংখ্যায় মুদ্রিত। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত "সমর সেনের কবিতা"য় এটি সংকলিত হয় নি।

অতীতের ছবি

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই—
মোটা দেয়ালের বাড়িঘর
নর্দমা পানের দোকান
গলির মোড়ে ঈষৎ কৌতুকহাসি
নীল-নীল গ্যাসলাইট।

বিশ-বাইশের যে-যুবক
বিকেলের শেষে
মই কাঁধে নিষ্ঠাবান
সর্বাঙ্গ সযত্নে মুছে
জ্বেলে দিয়ে যেত—
ঘরে ফিরে হয়তো সে
কুপি জ্বেলে কিশোরী বধূর
মুখের বিবর্ণ হাসি
দেখে খুশি হত।

তখন গ্যাসের আলোয়
আমাদের বেশ চলে যেত
জানি না এখন সেই
যুবকের চলছে কী করে।

পরস্পর

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

থরে-থরে-ফুটে-ওঠা ফুলের মতন
আকাশের সমস্ত বিস্ময়
ঘনিষ্ঠ মুখের মতো হয়।
সেখানে সমস্ত প্রশ্ন বলে ওঠে অন্তরঙ্গতায়
আমরা কোথায়?
শ্রাবণের মতো চুলে?
অথবা প্রমত্ত রাতে চাঁপার আঙুলে?

শব্দহীন রাত্রির মতন যখন দুচোখ জুড়ে
ঘুম ভেসে আসে
তৃপ্তির সুবাসে
তখনো তো এক বৃত্তে সাংসারিক পথের নিশানা—
পরস্পর একই ভাবে জানা।
বিস্ময় তবুও স্থির।
অসমাপ্ত অনন্ত প্রহরী।
প্রশ্ন জাগে এ জীবনে তাকে নিয়ে
পরিক্রমা কী করে যে করি!

বোধ

দেবাশিস প্রধান

১. আমার ভিতরে আমি ভাঙি-গড়ি
অবয়ব প্রতিমার, আলোর অন্বেষণে অনুভব
কেবল গড়ায়। তবু স্থির, পাথর চাঙড়
আলোর জিভে ভিজছে ছাইপাঁশ
আমার পাশেই শুয়ে আলগোছে অগাধ আঁধার।

২. কখন আবার,
এখন না হয় এলে—
এই তো বইছে ঝড়
স্পর্শে না হয় এসো সমর্পণে
উঠোন জুড়ে সময় কলস্বর
এই অবেলায় ঝড়ো হাওয়া
অলৌকিক ইচ্ছেরা কি নেভে?
ঘাসের ফুলে নীল জোনাকি
ঝাঁপিয়ে খোঁজে স্বপ্ন নাকি
বৃথাই চলে যাবার জন্য ভেবে।

কখন আবার? এই তো এখন
সঞ্চিত সংলাপে মগন,
না হয় বলো বুকের কাছাকাছি
আছি, আমরা আছি,
জলের ফোঁটায় নকল মুক্তো গাঁথা
এসো, আমরা বিছাই পদ্মকাঁথা।

যন্ত্রণার বিবিক্ত উঠোন

সুজিত সেন

যন্ত্রণার বিবিক্ত উঠোনে
বসে আছি
একাকিত্ব মেলে ধরে পাখা
পাখনায় লেগে থাকে
শিকড়ের আনত চুম্বন
পল্লবিত জ্যোৎস্নার
মূল থেকে
কে যেন হৃদয় পাঠায় :
একা নয়। একা নয়।
আছে। সব আছে…

তন্মাত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুভাষ ঘোষাল

সেদিনের শ্রাদ্ধবাসরে আমি দোতলা থেকে উঠে গিয়ে যেখানটাতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম অপর্ণার মধ্যে নেমে এসেছে মাসিমার ঠাম, সেখানে কোনো দ্বীপের দৃশ্য ছিল না। ভূখণ্ডের বদলে জলমহিমা ছিল। সেই সর্ব-গ্রাসী জলমহিমার দিকে তাকালে মানুষের করণীয় কিছু থাকে। বুঝতে পেরেছিলাম এমন কিছু আছে যা আমিই হয়তো সম্পন্ন করে দিতে পারি, এবং তা যদি করে ফেলা যায় তবে আর যাই হোক পৃথিবী অশুদ্ধ হবে না। শ্রাদ্ধবাসরে সেই ভারি রাতে দাঁড়িয়েও কানের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল বাক্যের পর বাক্য।—অপু দেখি একটা ছেলের সঙ্গে জলের পাড়ে গিয়ে বসল।—এ তো তবু ভালো, জলের পাড়ে গিয়ে বসতে দেখেছ। সেদিন কাকে যেন বলতে শুন-লাম, বিধুবাবুর বড়ো মেয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরোল। সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।—নালীকদা, তুমি যে বলেছিলে বাবার এখন কোনো মৃত্যু নেই। —কিন্তু জলমহিমার দিকে তাকালে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে স্পষ্ট দেখা যায় পূজারীর আঙুল যার মাথায় নেমেছে তার হাতে তানপুরা, তার ডাইনে বাঁয়ে গিরিরেখা এবং চিরতুষার। আমি হয়তো ভুল করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমি দেরি করব না। অপর্ণার সঙ্গে সুজনদার কথা শেষ হলে অপর্ণা আবার মা আর বোনের কাছে ফিরে গিয়ে বসে পড়ে। তখন ছাদের মুণ্ডিতমস্তক একমাত্র পুরুষের কাছে গিয়ে আমি বলতে পারলাম—কাল সন্ধেবেলায় তুমি বাড়ি আছ তো? আমার একটু কথা আছে।

—সন্ধেবেলায় আমাকে তুই পাবি না। একটু রাতের দিকে আসবি?

—আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি যদি আটটায় আসি?

—খুব ভালো হয়। আটটায় এলে আমাকে তুই নির্ঘাত পাবি।

সত্যিই রাত হয়েছিল। আমাদের বাড়ির দিকে নয়, দূরে কোথাও চারিদিক-কাঁপানো শব্দ হয়েছিল। এই শব্দের পর মাসিমা পা গুটিয়ে নিয়ে ভালোভাবে বসলেন। আমিও বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তা অন্ধকার। যেসব কুকুর আমাকে চেনে তারা শান্ত ছিল। যারা চেনে না তাদের কেউ-কেউ ডেকে উঠেছিল। আমাদের পাড়ার কোনো ঘরে পূর্ণশক্তির আলো জ্বলতে দেখেছিলাম এমন কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু গলিতে ঢুকেই বুঝতে পারলাম সেই বিপুল নিদ্রার পটভূমিতে যে ঘরটির আলো নেভে নি, তা আমাদের বাইরের ঘর। বাইরের ঘরের বাইরের জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। এই অতন্দ্রতা দেখে আমার ভয় হচ্ছিল মা হয়তো আমাকে বলে বসবেন —লোহা ছোঁও, আগুন ছোঁও, জামা-কাপড় ছেড়ে ফ্যালো।

পরের দিন অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটফুটে বিকেল পেয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক করলাম, তখন আর বাড়ি ফিরব না। হেঁটে একটু ঘুরে তবে বাড়ি ফেরা। বাড়ি হয়ে সুজনদাদের বাড়ি যাওয়া। কোথায় হাঁটা যায়? কোন্‌দিকে যাব? ডানদিকে ঘুরলাম। ডানদিকে যাওয়া মানে মানুষের যত্নে বানিয়ে তোলা অজস্র গাছ আর লম্বা একটুকরো জলপথ পেয়ে যাওয়া। অজস্র গাছ আর জলপথের ঠিক গায়ে যে ঘেরা জায়গাটি এখনও আছে তাকে আমরা শৈশবে উদ্যান বলে জেনেছিলাম। সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা একটি বর্গক্ষেত্র ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। বর্গক্ষেত্রের একদিকে সিঁড়ি এবং অন্যদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ ভূমি পর্যন্ত। ঢালু পথের শেষে এবং ভূমির শুরুতে ঝকঝকে বালির বিছানা পাতা থাকত। আমরা শৈশবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বর্গক্ষেত্রের মাঝখানে বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে পড়তাম। এই দাঁড়ানোটা ছিল সামান্য সময়ের স্থিতি। তারপরেই একে-একে সেই তৈলাক্ত তথা মসৃণ পথের ওপর সারা শরীর সঁপে দিয়ে হু-হু করে নীচে নেমে আসতাম। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ পারঙ্গম ছিল। তারা উদ্যানের প্রকৃত প্রাণ দেখিয়ে দিতে পারত। তারা সিঁড়ি দিয়ে বর্গক্ষেত্রে না উঠে মসৃণ আর পিছল পথ দিয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে যেত। সেই পারঙ্গম শিশুদের কারও সঙ্গে এত বছর বাদে আমার কোনোরকম যোগাযোগ নেই। সেই নেমে-আসা ঢালু পথ এবং ভূমির মিলনক্ষেত্রে ঝলমলে বালির পরিবর্তে ঝলমলে ঘাস গজিয়েছে। বহু গাছের তলায় এবং জলপথের পাশে লম্বা-লম্বা কাঠের আসন। ফুটফুটে বিকেলে একটিও খালি নেই। খালি পাবার আশাও করি নি। এক-একটা আসন ধুতি-পানজাবি-পরা বৃদ্ধদের অধিকারে। এক-একটা আসনে বর্ষীয়সী সধবারা পরিপূর্ণ। কোনো-কোনো আসনে কোনো সম্মিলন নেই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অচেনা হয়ে বসে আছে। শুধু একটা আসন এক-জনেরই দখলে ছিল। কিন্তু সেখানে হঠাৎ গিয়ে বসে পড়ার কোনো সুযোগই ছিল না। সারা আসন জুড়ে যে ফুটফুটে বিকেলে ঘুমিয়ে থাকে তাকে ডাকার ক্ষমতা আমার নেই। আশ্চর্য এই যে আমি সেদিন কোনো কাঠের আসনে কোনো তন্ময় যুগলমূর্তি দেখি নি। তারা জলের পাড়ে মাটিতে ছিল। গাছের তলায় মাটিতে ছিল। কদাচিৎ কেউ-কেউ ছিল ঝোপঝাড়ে।

জলের ওপারে চলে যেতে পারলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে। এপারে দাঁড়িয়ে তা বারে-বারে বুঝতে পেরেছিলাম। ওপারে যেতে গেলে আবার খানিকটা পিছিয়ে ঘুরে যেতে হবে। যখন পিছিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলাম তখন বকুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। গাছের তলায় বকুল পড়ে ছিল। এই ছোটো-ছোটো সুগন্ধ তারা আমি পিসিমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বহু বিকেলে কুড়িয়ে নিয়েছি। পিসিমার অজস্র কাজের মধ্যে এও এক কাজ ছিল। তিনি বারলির

কৌটোয় নিমের খড়কে রাখতে, রেখে-রেখে ভরিয়ে তুলতে যতটা সময় নিতেন ঠিক ততটাই সময় নিয়ে তিনি বকুলের পর বকুল গেঁথে-গেঁথে বৃত্ত পূর্ণ করে দিতেন। তাঁর ঘরে টুলের ওপর মারবেল পাথরের যে কৃষ্ণমূর্তি ছিল সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর নিঃশব্দ বকুলচর্চা এক সময় শেষ হত। তখন তিনি কী করতেন? থেমে যেতেন না। ডিমের কুসুমের মতো উরু অনাবৃত করে উরুতে তুলো রেখে সলতে পাকিয়ে নিতেন। এক-একটা সলতে মধ্যমার থেকেও লম্বা ছিল। সেগুলির দুপাশে এমন সব সূচীমুখ ছিল যা দেখে অদৃশ্য অগ্নির কথা মনে পড়ে যেত। পিছিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে যে অগ্নি দৃশ্যমান হল তা খণ্ডমেঘের রঙ হয়ে থেমে আছে। জলের ওপারে গিয়ে কিছু-কিছু চিনতে পারছিলাম। ওই তো স্নানঘাট। জল কালো হয়েছে কিন্তু স্নানার্থীর সংখ্যা বিপুল। রেল-লাইন পার হয়ে গামছা-সর্বস্ব ছেলেরা এসে দাঁত মেজে ডুব দিচ্ছে। প্রভূত ডুব ও সাঁতারের পাশাপাশি একজনই কোমর পর্যন্ত জলকে থামিয়ে রেখে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকার ভাবটিকে আনতে পেরেছিল পুরোপুরি। কোথাও না থেমে এগিয়ে গেলে চেনা-অচেনার হিসেবটা তত কঠিন আর লাগে না বলে এগোচ্ছিলাম। ঘাট নেই, ধীরে-ধীরে পা ফেলে-ফেলে জলে নেমে যাবার ধারা নেই, এমন দু-তিনটি জায়গায় মেয়েরা সজ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। যতগরিব ততটাই গতিময়ী হয়েছিল। সজ্ঘবদ্ধ হলে লজ্জা যে অনেক কমে যায় সে প্রমাণ রেখেছিল। জল শুধু জল তাদের ভিতরে গিয়ে-গিয়ে এনেছিল মধ্যরাতের একটি মণ্ডল।

এরই খুব কাছে একইভাবে আছে সেই বেদী। বেদীর ওপর গেঁথে দেওয়া আছে পাঁচটি কামান। পঞ্চ কামানের কালো-কালো মুখগুলি ঠিক সমকোণে বসানো কোনো দিনও ছিল না। তাহলে তাদের মুখ দ্বীপের দিকে থাকত, দ্বীপ থেকে একটু বেঁকে থাকতে পারত না। দ্বীপ এই জলপথে আছে এটুকুই জানি, কবে থেকে আছে তা আজও জানতে চাই নি। কোনদিন দেখিও নি মানুষের গড়া জলপথের ওই ছোট্ট দ্বীপটিতে মানুষ সজ্ঘবদ্ধ হয়ে চলে গেছে। বরং শুনে এসেছি ওই অনাহত ভূমিখণ্ডের জমে ওঠা তরুলতায় এমন সব সাপ আছে যাদের বিষ দুর্নিবার। একবার কি দুবার দেখেছি সাঁতার কাটতে-কাটতে কেউ একা-দ্বীপে উঠে দুদণ্ড পাড়ে দাঁড়িয়ে আবার নেমে পড়েছে জলে। দ্বীপের ভিতরে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্তরালে চলে যেতে সেও পারে নি। কোথাও একটু বসে থাকার যে ইচ্ছে অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটতে শুরু করেছিল তার পূর্ণোদয় হয়েছিল। আমি বেদীর ওপরে উঠে বসে পড়লাম। আমার বাঁদিকে কামান, আমার ডানদিকে কামান। আমার সামনে দ্বীপ, আমার পেছনে রেল-লাইন। এবং আমার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমকে মথিত করে দিয়ে যাচ্ছিল হাওয়া। আর কিছু নয়, এই পুণ্য গতি চেয়েছিলাম। এখান থেকে কিছুটা দূরে ঘেরা মাঠে কত দৌড়ঝাঁপ দেখেছি। একদিন দেখতে গিয়ে এক সাদা বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। মাথার টুপি থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত তাঁর সবকিছুই ছিল সুধবল। ঘেরা মাঠের দিকে যাচ্ছি এবং যেতে-যেতে আমরা কয়েক-জন দু-পাশের গাছ থেকে লাল-লাল বড়ো-বড়ো ফুল ছিঁড়ছি। ফুল ছেঁড়া বারণ। আশেপাশে দারওয়ান নেই। আমাদের অপরাধজনিত সুখ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তখনই বড়ো-বড়ো ঘাসের মধ্য থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি সাদা বৃদ্ধ। তিনি শান্ত স্বরে বলে উঠেছিলেন—তোমরা কী করছ?—ওই স্বর শোনার পর আমাদের আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। আমরা নতমস্তকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম দৌড়ঝাঁপের কেন্দ্রে। তখনই তো সেই শান্ত স্বরে আবার শোনানো হল—কোথায় যাচ্ছ? এদিকে এসো। —আমরা ভয়ে-ভয়ে পেছন ফিরে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। তিনি এবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। এবার ভয়ের সঙ্গে এসে মিশল শ্রদ্ধা। কী সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল, কী শুভ্র আর সনাতন। একে-একে

সবাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি পেছন ফিরে যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিকে চলতে শুরু করলেন। আর আমরা তাঁকে নবোদ্যমে অনুসরণ করলাম। কিছুদূর হাঁটার পর তলার সবুজে দেখা দিয়েছিল নির্ভার ঐশ্বর্য। তেমনই কোনো ক্ষেত্রে তিনি বসে পড়লেন। আমরা তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসলাম। তিনি প্রথমে কোনো কথা না বলে যে সময় নিয়েছিলেন সেই কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তে-আস্তে জন্ম নিল মুখমণ্ডল, হাত-পা এবং বুক। সবই নীরবতার। আমরা সেই নবজাতককে সম্মান করতে শিখলাম। তিনি ধীরে-ধীরে আমরা যে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তার পরিচয় দিলেন। বললেন তার ইতিহাস। শেষে তার নাম বললেন। —কলাবতী। তোমরা কলাবতীকে ছিঁড়ে ফেলছিলে। কিন্তু কেন? ফুলের যে চেতনা আমাদের চেতনার পাশাপাশি থেকে চৈতন্যের বিরাট আয়োজনকে সাহায্য করে যাচ্ছে তিনি তাকে আমাদের সামনে যেন সমাগত করেছিলেন। তারপর আমাদের প্রত্যেকের নাম জেনে নিয়েছিলেন। আমার নাম শুনে আমার দিকে তাকিয়ে একটি করুণাময় ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। লজ্জা কোরো না। 'সান্ত্বনা' বানান করো তো? আমার নির্ভুল বানান শুনে তিনি আমার হাত টেনে নিয়ে তার হাতের মধ্যে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষিকোমল হাতের তাপ হাতে নিয়ে আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর ঘেরা মাঠে গিয়ে দেখি কালো-কালো ছোটো-ছোটো প্যানট পরে মেয়েরা লোহার বল ছুঁড়ছে। এ-কথা স্বীকার করব, না করে উপায় নেই, অন্যদিনের মতো সেদিন আর দলবদ্ধভাবে ঘেরা মাঠে বসে ছেলেমেয়েদের বালিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা, অথবা যারা বর্শা ছুঁড়ছে তাদের অহিংস উজ্জ্বলতা লক্ষ করা কোনোটাই আমার হয় নি। কেবলই মনে হচ্ছিল মাঝে-মাঝে দলচ্যুত হওয়া ভালো। সেই মন নিয়ে আমি সামান্য অজুহাতে ঘেরা মাঠ ছেড়ে ঘেরা মাঠ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম যেখানে তা অদূরের সম্পদ। সেই যে লম্বা জলের ফালি তা এঁকে-বেঁকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঝুলন্ত সেতু আছে। সেতুর মাঝামাঝি গেলে ইচ্ছে করলে দেখে নেওয়া যেত সেতু যে কাঁপে সেই কেঁপে-ওঠা ব্যাপারটা কেমন। আমার কিন্তু সেদিন সে-ইচ্ছেটুকুও ছিল না। মনে প্রশ্ন উঠেছিল, সেতু দোলানো শেষপর্যন্ত ফুল ছেঁড়ার সমগোত্রীয় কোনো কর্ম কিনা। সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে-ছিলাম। আমার চোখ ছিল জলখণ্ডের দিকে। জল-খণ্ডের সমস্তরকম নিথরতা মুছে দিয়ে মাঝে-মাঝে মুখ তুলত মাছেরা। সেই সব উর্ধ্বমুখে সেতু থেকে ঝরে পড়ত খাবার। খাবার মানে সদ্য কিনে আনা গরম তাপ লেগে থাকা সরু-সরু মুড়ি। সেদিন আমি সেতুর ওপর থেকে কোনো মুড়ি ঝরাতে পারি নি। কিন্তু নতমস্তকে অপেক্ষার ফল ফলেছিল। সুদেহী মাছেদের দলটি ধীরে-ধীরে এসে ভেসে উঠে ডুবে গিয়েছিল। সে এক উদ্ভাস। আমি সেদিন দলটির পুরোভাগে এমন এক কৃষ্ণ বিশালতা দেখেছিলাম যাকে আজ মীননাথ বলতে কোন কষ্ট হয় না। সন্ধের মুখে সেদিন কামানের বেদী থেকে উঠে পড়ে বাড়ির পথ ধরতে সবিশেষ কষ্ট হয়েছিল।

মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে বেরোতে যাব, মা এলেন। হাতে নীল চিঠি।—অণিমার চিঠি এসেছে দেখেছিস? তোকে যেতে লিখেছে। অনেক দিন তো কোথাও যাস নি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আয় না। —দিদি আর কী লিখেছে? দেখি চিঠিটা। অনেক দিন বাদে চিঠি এল। আমার সহোদরা বলে কিছু নেই। জ্যাঠা-মশাইয়ের বড়ো মেয়ে আমাদের দিদি। আমার থেকে কয়েক বছরের বড়ো। মাইল-মাইল-ছড়িয়ে-থাকা একটি গিরিরেখার খুব কাছে থাকে। স্বামী অফিস-সূত্রে যে বাড়ি পেয়েছে তার সামনে পেছনে বহু জায়গা আছে। সেসব ক্ষেত্র দম্পতির বৃক্ষচর্চায় সমৃদ্ধ। দিদির চিঠিতে বহু গাছের নাম থাকে, বহু ফলের খবর থাকে, বহু পাতার চিত্রোপম বর্ণনা থাকে। বৃক্ষের জগতেও বিবাহের দ্বারা, মিলনের দ্বারা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে দিদি তারও পুঙ্খানু-পুঙ্খ ব্যাখ্যা সম্ভব করে তোলে। সে ডাকঘরের খাম ব্যবহার করে না। তার নিজস্ব নীল খামে তার সবুজের খবর আসে। সেদিনের চিঠি জুড়ে ছিল বহু আতার আসন্ন উদয়ের সংবাদ। আতায় ছেয়ে যাবে বাগান এমনই এক ভবিষ্যৎ দেখে দিদি ফুল্ল ছিল। শুধু তাকে ভাবিত করে রেখেছিল বাদুড়েরা। দিদি জানে আতা আমার কত প্রিয় ফল। এই শহরে আমি কত ঘুরে-ঘুরে আতা পাবার চেষ্টা করেছি। দিদি যে যেতে লিখেছে তার পেছনে আতাজগতের ডাক আছে। এখনই আবার বেরোচ্ছিস? —মার এই প্রশ্ন গত রাতে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার যে শ্রম তাতে সিক্ত মনে হল। —তুমি চিন্তা কোরো না, একটু বিশেষ কাজে বেরোচ্ছি। দেরি হলে আমার খাবার ঢেকে রেখে খেয়ে নিও।

পদাতিকের পক্ষে কোথাও সময়ে পৌঁছনো তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি ঠিক আট-টাতেই সুজনদাদের দোতলায় পৌঁছে গেলাম। শ্রাদ্ধের ঠিক পরের দিনই বোঝা যায় না মৃত্যু যাকে নিয়ে যায় তার অভাব। তখনও যে নানা মানুষ আসে যায়, ওঠা-নামা করে এবং এটা চলতে থাকে অন্তত এক সপ্তাহ। সুজনদাদের দোতলায় অ-পারিবারিক এবং অত্যুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। যারা দূর-দূর থেকে এসেছে তাদের কোনো-কোনো শিশুর কান্না ভিতর থেকে ভেসে আসছিল। আর যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তা প্রায় সঙ্ঘটনের পর্যায়ে পড়ে যায়। যে বাড়িতে আগের দিন শ্রাদ্ধবাসর বসেছিল এবং পরের দিনও মৎস্যগ্রহণের আসর বসবে, যে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনেরা সত্যিই ভিড় করেছে, সে-বাড়ির বাইরের ঘরটি আমি গিয়ে মনুষ্যশূন্য দেখেছিলাম। মেঝেতে সতরনজি পাতা ছিল, এদিকে-ওদিকে দু-তিন জোড়া কাপ-ডিশ পড়ে ছিল, কিন্তু ছিল না কেউ যাকে আমি জিজ্ঞাসিত করে দিতে পারি—সুজনদা আছে? আসলে এ-রকম যে কখনও-কখনও হয় তার কারণ ঠিক তখনই ভিতরটা খুবই ভরে ওঠে, একেবারে পূর্ণ হয়ে যায়। সেই আপূর্যমাণ অন্দর সৃষ্টি হয় বলেই কাজের বাড়ির সদরেও নেমে আসে এই অভাব, এই বিজনতা, এই অপেক্ষা করে থাকার অস্বস্তি। আমি বসে-বসে আরও প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছিলাম।

একসময় সিঁড়ি থেকে কেউ সুজনদার নাম ধরে ডেকেছিল। পরের দিন সকালের জন্য সে মাছ নিয়ে এসেছে। এই মৎস্যনীরবতা দেখতে ভিতর থেকে প্রায় সবাই উঠে এল। সুজনদা মাছ দেখে বাইরের ঘরে আসার আগে পর্যন্ত আমার প্রস্তুতি অব্যাহত হয়েছিল।

—তুই এসে গেছিস! চল আমরা ছাদে যাই। অপু, নালীক এসেছে। আমাদের জন্য একটু কফি করিস।

ওই মীনজনিত সমাবেশের মধ্যে আমি অপর্ণাকে ঠিক দেখতে পেলাম না। বাইরের ঘরে যে সতরনজি পাতা ছিল সুজনদা সেটা গুটিয়ে হাতে নিয়ে নিল। আর-এক হাতে নিল ঝাঁটা। সতরনজি পাতার আগে সুজনদা যখন ছাদ ঝাঁট দিচ্ছিল, আমি নক্ষত্রের প্রাচীন পরম্পরা ধরে-ধরে একটি শ্বেতবর্ণের মেঘকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

—কী কথা নালীক? খুব বড়ো কোনো কথা, না-কি খুব ছোটো-ছোটো কথা?

—তুমি হাসছ, সুজনদা। কিন্তু আমি ভাবছি কী ভাবে বললে মানায়।

—তুই সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে কিছু বলছিস না, আমার কাছে বলছিস।

—সমস্যা তো সেখানেই। ব্যক্তিগত কথা বলা সবচেয়ে কঠিন। তবু কদিন ধরে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা শোনো, তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি অপর্ণাকে চাই। অপর্ণার আপত্তি না

থাকলে আমি অপর্ণাকে চাই। এই আমার সার কথা, এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।

—তোর সমস্ত ব্যাপারে আমার সমর্থন আছে। এটা তার বাইরের কিছু নয়। ঘটনাচক্রে অপু আমার বোন বলে শুধু একটা কথাই বলব, তুই এখনই একবার অপুর সঙ্গে কথা বলে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়।

সুজনদার এই বাক্য শেষ হবার পর এমন কিছু সময় অতিক্রান্ত হল না যাকে বেশিক্ষণ বলা চলে। ওই অন্ধকারে দু-হাতে দু-কাপ নিয়ে অপর্ণা যখন এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার হাত যদি কেঁপে গিয়ে থাকে তবে তাকে আমি কোন শব্দে দাঁড় করাব এই ভাবনা খুব বড়ো হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে কাপ নিয়ে মেঝেতে রাখি। অপর্ণা কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে, আমি সুজনদার পাশে বসেছি আবার, ঠিক তখনই সুজনদা তার কাপ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে অপর্ণাকে ডেকে ফেলল।—অপু শোন, নালীক তোর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। তুই বরং ওর সঙ্গে কথা বল, আমি নীচে গিয়ে দেখি মাছগুলো কোথায় রাখল।

সুজনদা এত তাড়াতাড়ি এভাবে আমাকে অপর্ণার সামনে ফেলে দেবে তা বোধ হয় সুজনদা নিজেও জানত না। আমাদের বাড়িতে পুজোর সময় আরতির মুহূর্তে দুরকম প্রদীপ জ্বলতে দেখে এসেছি। প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ। একই সঙ্গে গাঁথা পাঁচটি দীপাধারে পিসিমার উরুতে রেখে বানানো সলতেগুলি জ্বলে উঠত শান্তভাবে। আমরা নির্ভয়ে তার তাপ নিতাম। তারপর একটি ছোটো এবং গোলাকার ক্ষেত্রে কর্পূর রেখে কর্পূরদীপ জ্বালানো হত। তখনই দেখা যেত প্রজ্বলন। সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে অগ্নি তার পূর্ণরূপে প্রকাশ পেত। এত ছোটোক্ষেত্র থেকে এত দ্রুত এত প্রজ্বলন দেখে আমরা তাপ নিতে গিয়ে ভয় পেতাম। কিন্তু ভয়ের পাশাপাশি এমন এক গন্ধ যুটে উঠত যাতে জড়িয়ে থাকত কর্পূরশুভেচ্ছা। সেই শুভেচ্ছা থাকত বলেই আমরা আগুনের কাছে করতল রেখে সেই তল বুকে মাথায় ঠেকানোর কাজটি শেষ করতে পারতাম।

—বোসো অপর্ণা।

অপর্ণাকে জিজ্ঞেস না করেই আমি কফি ভাগ করলাম, ডিশ তার কাছে রাখলাম।

—এই একটু আগে চা খেয়েছি। এইটুকু কফি আবার ভাগ করতে গেলে কেন।

সতরনজির একেবারে শেষ মাথায় অপর্ণা বসে পড়েছে। কফি আর কতটুকু কালক্ষেপ এনে দিতে পারে? কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তে-আস্তে জন্ম নিল মুখমণ্ডল, হাত-পা এবং বুক। সবই নীরবতার। কী বলব তা আমার কাছে পরিষ্কার, কোনো কুয়াশা নেই তার মধ্যে। কী করে বলব সেটাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। যেভাবেই বলতে যাই নিজের কানেই তার আর কোনো গুরুত্ব থাকছিল না। শেষে প্রজ্বলিত হলাম।—অপর্ণা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি তোমাকে চাই। বহু বছর ধরে তোমাদের বাড়িতে আসছি। এ তো সত্যি যে আগে কখনও এ ভাবনা আসে নি। কিছুদিন ধরে শুধু ভাবছি, তোমার যদি অনিচ্ছে না থাকে আমি তোমাকে চাইব। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

আমি জানি, আমার এই থেমে-থেমে-বলে-যাওয়া কথাগুলো অপর্ণা কোনো দিনও আশা করে নি। আমিও আশা করি নি ঠিক সেই মুহূর্তে উজ্জ্বল গৈরিকে ঢাকা শ্রমণের লক্ষ্যের দিকে হেঁটে যাবার ছবি এবং শব্দ এত বছর বাদে মনে পড়ে যাবে। লম্বা জলের ফালি বাঁদিকে রেখে দিনশেষে যে শ্রমণ তার বিহারের দিকে এগিয়ে যেত তার হাতে থাকত একটি গোলাকার আধার। ওই আধারে থেমে-থেমে সে আঘাত করলে বুম-বুম শব্দ হত। একটি শব্দের পর আর-একটি শব্দ আসতে যে সময় নিত সেই সময়ের মধ্যে এমন একটা শূন্যতা ছিল যা দিগ্বিজয়ী। অপর্ণা তার কফির ডিশ উপুড় করে রেখে তার ওপর দিয়ে আঙুলের দাগ কাটছিল। দাগ কাটতে-কাটতে সে

এক সময় ভেসে উঠল এবং আমি ঝুঁকে পড়ে বুঝতে পারলাম জল তার চোখ থেকে বেরিয়ে নীচে এগিয়ে আসছে।—আমার কিছু বলার নেই, নালীকদা। তুমি মাকে বলো। হাওয়া, রাত, খণ্ড-খণ্ড মেঘ এবং নক্ষত্রের এত নির্মাল্যের তলায় বসে এর চেয়ে ভালো উত্তর আমি আশা করি নি। আঙুল দিয়ে তার ডিশের ওপরের আঙুলগুলি তুলে নিয়ে আমার বাঁ-হাতের তালুতে রাখলে সে অবিচলিতই থেকে গেল। প্রথম দিকে সে হারমোনিয়াম বাজাতে পারত না। প্রথম যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম মনে পড়ে তার গানের জন্য হারমোনিয়াম টেনে নিয়েছিলেন মাসিমা। 'তুমি মাকে বলো'—এই কথার মধ্যে সেই পুরোনো নির্ভরতা নবশক্তিতে ভুলে উঠেছিল। আমার বাঁ-হাতের তালুতে অপর্ণার ডান হাত তুলে এনে রাখার পর আমার ডান হাত তার ওপরে রেখে আমি যে বেষ্টনীর সৃষ্টি করি তাকে স্বল্পায়ু করার যে-কোনো রকম চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। এমনই এক সম্বন্ধতার সময়ে অপর্ণা তার নতদৃষ্টিকে একবার তুলে আমাকে দেখেছিল। সে বোধ হয় তখনই বলতে চেয়েছিল—তুমি দেখি সান্ত্বনা বানান করে ফেলেছ।

এক সময় আমি নিজেই বেষ্টনী ভেঙে দিয়ে ঠিক-ঠিক ছাদে ফিরে এলাম। সে তার হাত দুটি জড়ো করে কোলের ওপর রাখল। তখন তাকে আমার দু-একটি স্বপ্নের কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল। তখন তাকে আমার দু-একটা জাগরণের কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল। বলার ইচ্ছে হয়েছিল যে নিজেও জানি না কী করে স্বপ্নগুলি জাগরণ ছুঁয়ে থাকে এবং জাগরণগুলি স্বপ্ন থেকে রস সংগ্রহ করে। কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। অপর্ণার ছাদ থেকে রেললাইন কোনো দিনও দূরে ছিল না। কিন্তু তার মুখোমুখি বসে যখন আর কোনো কিছুই বলা হয়ে উঠছিল না তখন যে ট্রেন চলে যাচ্ছিল তার শরীরের শব্দগুলি ভেঙে-ভেঙে, ভেঙে-ভেঙে দুরন্তে ডুব দিয়ে উঠেছিল। আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম—অপু, গান ছাড়তে পারবে না। তোমাকে আবার শুরু করতে হবে। কী, তাই না?

প্রায় স্বগতোক্তি ছিল উত্তরে—গান তো আমি ছাড়ি নি, গানই আমাকে ছেড়েছে।

—তাই যদি হয় তুমি আবার গানকে ডেকে নিয়ে আসবে। রোজ ভোরে উঠে তুমি যদি রেওয়াজ কর গান না এসে পারবে? তোমার কত সুবিধে। তুমি কত সুন্দর একটা ছাদের ঘর পেয়েছ। তুমি তো ভোরে উঠে এই ঘরে চলে আসতে পার?

—ভোরে উঠতে পারলে তবে তো। অনেকবার চেষ্টা করেছি ভোরে ওঠার, কিন্তু পারি নি। তুমি বসো, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেদিন রাতের ছাদে মাসিমাও এসেছিলেন। তবে নীচে নেমেই অপর্ণা মাসিমাকে ওপরে পাঠাতে পারে নি। তাঁর আসতে দেরি হয়েছিল। মাসিমা গম্ভীর ছিলেন না, আবার সহাস্য বলতে যা বোঝায় তাও তাঁকে মনে হয় নি। তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোঝা যায়, সুজনদা কিংবা অপর্ণা, কারও না কারও কাছ থেকে তিনি যা জানার জেনে এসেছেন। রাতের ছাদে সেই প্রথম তাঁকে একা পাওয়া আর তাঁর মুখোমুখি হওয়া। মাসিমা আমার ঠিক পাশে এসে বসে পড়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন।—সব শুনেছি, নালীক। আমার সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার মেসোমশাই একথা শুনে যেতে পারলেন না। খুব ঝড় উঠবে কিন্তু। সেটা চিন্তা করে ভয় হচ্ছে। সামলাতে পারবে তো?

লম্বা জলক্ষেত্রে বহু বিকেলে দেখা গেছে সরু-সরু নৌকো খুব তাড়াতাড়ি একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। কোনো-কোনো নৌকোয় মানুষের সংখ্যা পাঁচ। কোনো-কোনো নৌকোয় দুই বা তিন। আর এমন নৌকোও ছিল যেখানে একজনই মানুষ। এইসব রেখার মতো নৌকোয় যারা বসে তারা প্রত্যেকেই চালক। প্রত্যেকেই পেশী সঞ্চালিত করে শ্রমে ও

উদ্যমে দ্রুত এগিয়ে যাবার খেলায় নামে। যেখানে মানুষ একাধিক সেখানে প্রেরণার থেকেও পরিশ্রম অনেক মূল্যবান। সবাই মিলে স্বেদ ঝরিয়ে ছুটে যায় একদিক থেকে অন্যদিকে। যেখানে একজনই মানুষ সেই নৌকোয় প্রেরণাই সব। পেশী প্রেরণার দ্বারাই ফুলে ওঠে। যে শিস দিতে-দিতে দুহাত ঝরিয়ে-ঝরিয়ে দ্বীপের পাশ দিয়ে প্রধাবিত হয়েছে একবার ইচ্ছে হল মাসিমাকে তার কথা বলি।—কী নালীক, চুপ করে আছ, পারবে তো?

—মাসিমা, আমি অপুকে কিছু বলার আগে অনেক ভেবেছি। আপনি ভাববেন না। আমার উত্তরে কি কোনো সন্দীপন ছিল? কোনো তিথি ছিল যাকে প্রাণময় বলা যায়? শ্রাদ্ধের পরের রাতে, নিয়মভঙ্গের আগের যে রাত সেই রাত্রিতে, ছায়াপথ, নীহারিকা, কোন্ বিশাল দুগ্ধমার্গ, মেগালানিক মেঘমালা, স্মৃতিক্ষেত্র, নাকি সেতু, শকুনসঙ্গতি, শ্মশান, অশথমথিত ঘরবাড়ি, জানি না কোন্ মণ্ডল থেকে নির্ভয়তা এসেছিল, আবেগ এসেছিল, শুভেচ্ছার কোনো এক বিস্তার এসেছিল। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার শিরে রেখেছিলেন তাঁর চুম্বন। এই শির ঘ্রাণ পরে আমি অন্যদিনের মতো অনর্গলভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে পারি নি। আমি ধীরে-ধীরে নামছিলাম এবং প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠেছিল চন্দনের গন্ধ। ছাদ থেকে দোতলা পর্যন্ত এই অবরোহণের পর্বে মাসিমাকে সঙ্গে পাই নি। তিনি না নেমে ছাদের ঘরের তালা খুলেছিলেন। কোনো-কোনো অবরোহণে থেকে যায় তালা খোলার শব্দ।

বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ জেগে থাকার যে ইচ্ছে জেগেছিল তা যথাসাধ্য মিটিয়েছিলাম। কোনো বই পড়ে জেগে থাকি নি। আমার টেবিলে সব সময় অন্তত দশ-পনেরোটি বই না থাকলে টেবিল খুব খালি-খালি লাগে। সেদিনও টেবিল পূর্ণ ছিল। একটির পর একটি বই হাতে তুলে নিয়ে যতই পাঠের চেষ্টা করছিলাম ততই মন অন্য কিছু চাইছিল। আর আমি চিরকালই মনের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকাটি পালন করে এসেছি। সেদিনও সেই দায়িত্বে আন্তরিক ছিলাম। সেদিন এক বই থেকে অন্য বইতে যেতে-যেতে শেষ পর্যন্ত অভিধান টেনে নিয়েছিলাম। কে এখনও বলে বাঙলায় শব্দের কোষাগারে তত অর্থ নেই। তাকে অজ্ঞ বলার প্রকৃত সময় এসে গেছে। আমি 'অক্ষি'-র পাশে 'অখণ্ড'-কে পাচ্ছি। 'অক্সিজেন' থেকে চলে যেতে পারছি 'কল্পান্ত'-তে। 'নির্বর্ষ'—এই শব্দটির পরে 'স্নাতকোত্তর'-কে পেতে তেমন কোনো বিলম্ব হয় না। সেই পেয়ে-পেয়ে যাবার অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমি পেলাম 'মঞ্জিমা'। মানে, শোভা, সৌন্দর্য, মনোজ্ঞতা। আমি অপর্ণাকে গানে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। সে যখন গানের মধ্যে ছিল, কিংবা আমি তাদের বাড়ি প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম তখন বাক্স থেকে যেটিকে বের করে আনা হয়েছে, যার ওপর বহুদিন মাসিমার আঙুল পড়েছে, তা আর যাই হোক আজ আর শোভন, সুন্দর এবং মনোজ্ঞ নেই। কখনও-কখনও পাকেচক্রে কানেও ভেসে এসেছে অপর্ণার গুঞ্জন—হারমোনিয়ামটা একেবারে গেছে।

প্রতিগুঞ্জন মাসিমার—এ তো আর আজকের নয়। আমার বিয়ের আগের। এখন চট করে নতুন পাবি কোথায়? সবকিছুর কত দাম বেড়ে গেছে। সেদিন 'মঞ্জিমা' এই শব্দটি অভিধান থেকে উঠে এসে আমার হৃদয়ে জায়গা পায়। বিছানায় যাবার আগে লক্ষ করি মা দিদির চিঠি ভুল করে আমার টেবিলে রেখে চলে গেছেন। সন্ধেবেলায় ব্যস্ততার মুখে যে চিঠি কোনোমতে শেষ করেছিলাম তা আর একবার পড়তে গিয়ে দিদি তার বাগানের উদীয়মান আতাগুলির সম্পর্কে কী পরিমাণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে বুঝতে পারলাম। বাদুড় এবং ব্যাপক বাদুড়েরা আতার ওপর নেমে আসে। তারা ঠিক-ঠিক সন্ধান পায়। সেই সন্ধানীদের হাত থেকে আতারক্ষায় দিদি যাদের পরামর্শ নেবে তারা কি দিদিকে বলবে লোহার জাল দিয়ে গাছ ঢেকে রাখো? সে কেমন ব্যাপার? বিছানায় যাবার আগে এই বিস্ময়ের হাত ধরে থাকতে চেয়েছি। আমার যে হলুদ জলপাত্রটি মা প্রতিদিন পূর্ণ করে রেখে যেতেন তার কাছে পৌঁছতে সেদিন যে দেরি হয়েছিল তার জন্য অতিরিক্ত তৃষ্ণাবোধ ছিল নিঃসন্দেহে।

আমার সার কথা অপর্ণাকে শোনানোর কয়েকদিন বাদে আমি একদিন অফিসে গিয়ে একটা সবুজ আর কয়েকটা সাদা রঙের কাগজে আমার স্বাক্ষর দিয়ে রাখি। তারপর একটি চিঠির মাধ্যমে অফিসকে যে অধিকার দিয়ে দিই তার মাধ্যমে অফিস আমার প্রতি মাসের বেতন থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা কেটে যেতে থাকবে যতদিন না ধার শোধ হয়। এই চিঠি আর কাগজপত্রের সমবেত শক্তিতে আমি কিছু টাকা পেতে পারি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবার চেষ্টা করি কোথায় গেলে প্রাপ্য টাকার সমপরিমাণ অর্থের দ্বারা সত্যিকারের ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। প্রায় প্রত্যেকেই যে দোকানটিকে চিহ্নিত করে তা আমার অফিসের খুবই কাছে। দোকানটির পাশ দিয়ে এর আগে বহুবার গেছি। দেখেছি অন্তত চার-পাঁচজন কোলের ওপর যন্ত্রাংশ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এবার দোকানের মধ্যে যাবার প্রয়োজন হল। যাঁর হাতে অগ্রিম অর্থ দিয়ে এলাম তিনি হাঁপানির রুগী। দোকানে তিনি সকালের দিকে আর বসেন না। সন্ধের পর তাঁকে দোকানে পাওয়া যায়। তখন চুপচাপ বসে আছেন, কাজকর্ম দেখছেন, বিক্রির টাকা নিচ্ছেন এমন কোন প্রচলিত মুদ্রায় তাঁকে দেখার আশা ছাড়তে হবে। একটা কেমন টানের ভাব নিয়ে যে জিনিস নির্মিত হয়ে আসছে, যা বাইরের দিক থেকে সম্পূর্ণ, তিনি সেটাকে উবু হয়ে বসে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। এই পরীক্ষাপর্বে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কে বলল অভিজ্ঞতা নয়। তাঁর নেড়ে দেখার ফলে, তাঁর আঙুলের অবাধে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাওয়ায় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা কোনো-কোনো পীতাম্বর নৈঃশব্দ্যের মতো অবগাহনক্ষম। আমি যেদিন সন্ধের পর অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর নাম শুনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তিনি একটি সদ্যোজাগ্রৎ যন্ত্রের বুকের ওপর দিয়ে আঙুল নিয়ে গিয়ে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিলেন তার কথা ভুলে যাবার মতো শক্তি আমার কোনোদিনও হবে বলে মনে হয় না। কাজ শেষ করে তিনি আমার কথা শুনলেন। তিনি শেষে জানতে চাইলেন যেগুলির বোধন হয়ে গেছে তারই কোনো একটা বেছে দিলে আমি নেব কিনা। আমার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম এবং জানালাম পরের দিন থেকে কাজ শুরু করে কয়েকদিনের মধ্যে একটি নতুন যন্ত্র বানিয়ে দিলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব। যে হাসি পাঠ করা যায় না সহজে এমন কোনো হাসি আমার কথায় তিনি উপহার দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। জিনিস নিয়ে যাবার যে দিন উল্লিখিত হল যে সময়ের কথা উঠল তখন তাঁকে পাব না, তবে তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সবই সুসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, এই কটি কথা পরপর বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে কেশে উঠলেন তা দেখলে কষ্ট হয়, যুক্ত হয় চিন্তা। কষ্ট আর চিন্তার একটি সমানুপাত নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু অসম্পূর্ণ হয়ে নেই। তিনি কর্মচারীদের আগের দিন রাতে সবকিছু দেখিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে তবে বাড়ি গেছেন। একটি পূর্বাপর কৃষ্ণ বাক্সের মধ্যে আমাকে দেখানোর পরে নামিয়ে দেওয়া হল যন্ত্রটিকে। কর্মচারীদের একজন, বলতে হল না ছুটে গিয়ে নিয়ে এল রিকশা। আমি বসলে আমার দু-পায়ের মাঝখানে বাক্সটির জায়গা করা হল। আমি লক্ষ্যের দিকে যেতে-যেতে চালককে কয়েকবার বলেছিলাম—ভাই, খুব সাবধান। আস্তে-আস্তে দেখে-দেখে চলো।

সেদিন ছিল শনিবারের দ্বিপ্রহর। এ বিশ্বাস দৃঢ়

ছিল, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার মানুষজন খাওয়া-দাওয়ার কাজ সেরে তখনও ঘুমের মধ্যে চলে যেতে পারে নি। আমি তো দুপুরে গিয়ে-গিয়ে দেখেছি খাওয়ার ঠিক পরে এক-একজন কী ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একজন তো খেয়ে উঠে ছাদে উঠে গিয়ে দড়িতে টাঙানো শাড়ি পুনর্বিন্যস্ত করে চুলছাড়া অবস্থায় ঝুঁকে পড়বে। আমি জানি তখন সে সবকিছু দেখতে-দেখতে কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত দেখে উঠবে না। সে ভূমির দিকে সমত থেকে একসময় এত অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে তাকে না ডেকে যদি তার পেছনে সাধারণ পদশব্দ রাখা যায়, যদি সারা ছাদ ঘুরে-ঘুরে কোথাও থেমে বসে পড়া যায়, সে টেরও পাবে না। আর-একজন হয়তো খেয়ে উঠে খাঁচা তুলে এনে ঘরের মাঝখানে রাখবে। পাখির সামনে লাল লঙ্কা ধ'রে বাঁ-হাতের লম্বা নখ দিয়ে ভিজে ছোলা ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে। আর এই ধরা আর ছেঁড়াকে একসূত্রে গেঁথে রাখবে একটি সবুজ অন্যমনস্কতা।

রিকশা থেকে নামার আগেই চালকের হাতে টাকা দেবার কাজটা সেরে ফেলেছিলাম। লোকটি যন্ত্র তুলে নিয়ে আমার আগে-আগে যাচ্ছিল। পেছনে থেকে তাকে পরিচালিত করতে গিয়ে অপর্ণাকে দেখলাম। অপর্ণা ছাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। চিৎকার করার অবকাশ ছিল ঠিকই। সে ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করতে পেরেছিলাম। বলা বাহুল্য, চালক আমার আগেই দোতলায় উঠে গিয়ে ভার নামাতে পেরেছিল। আমি গিয়ে দেখলাম বিহঙ্গবৃত্তের সামনে শোণিমা উপবিষ্ট এবং শোণিমার সামনে যন্ত্র রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে চালক।—কী ব্যাপার, নালীকদা? কী এসব?

—মাসিমা কোথায়? একটু ডেকে দেবে?

পাশের ঘর থেকে শোণিমার সঙ্গে মাসিমা এলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর মুখ কিছুটা তন্দ্রাজড়িত হতে যাবে এমন সময় উঠে এসেছেন। যে কাপড় পরে আছেন সেই কাপড়ের কোণ দিয়ে মুখ মুছে হেসে ওঠার চেষ্টা ছিল।

—এসব কী নালীক?

সামনে, আমাদের প্রত্যেকের সামনে যে কালো রঙের বাক্সটি স্থিতলাভ করেছিল তার ডালা খুলে দিলাম।—মাসিমা, কিছু মনে করবেন না। অপুর বিয়েতে আমার উপহার। আমি সন্ধের দিকে আসব। শুধু একটু লক্ষ রাখবেন তার আগে হারমোনিয়ামে যেন হাত না পড়ে। এ কথাটা কেন যে বললাম তা তখন বুঝতে পারবেন।

সেদিন দুপুরে আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াই নি। রিক্‌শা করে হারমোনিয়াম আনার সময় থেকে একটি ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি মনে-প্রাণে ভেবেছিলাম অপর্ণা হারমোনিয়ামে হাত দেবার আগে এই যন্ত্রের উদ্বোধন হবার প্রয়োজন আছে। এ কথা কাউকে বলতে চাই নি। শুধু সন্ধে পর্যন্ত যে-অপেক্ষা তা ছিল আশাবাদীর উপবেশন। সন্ধের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুরু দুরু বক্ষে বাদ্যযন্ত্রের দোকানের কাছে গিয়ে কী বলব আরও একবার তা ভেবে নিলাম। ওই তো তিনি যাকে খুঁজছি, যিনি উবু হয়ে নির্মিত যন্ত্রে আঙুল রেখে বোধনের পথ করে দিচ্ছেন।

—আপনার কাছে আবার এলাম।

তিনি যন্ত্র থেকে মুখ ওপরে তুললেন।—কী ব্যাপার? কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

—না, মানে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—বলুন না, থামলেন কেন?

—আমি যে বাড়িতে হারমোনিয়াম দিয়ে এসেছি সে বাড়িটা খুব কাছে। রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে কয়েক মিনিটের জন্য দয়া করে আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটু বাদে আমি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। যাবেন তো?

—কী হয়েছে ঠিক করে বলুন তো? আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন কেন?

—আপনি গিয়ে দুমিনিট বাজিয়ে হারমোনিয়াম-টার উদ্বোধন করে দেবেন।

—অদ্ভুত কথা বললেন। আমাকে আজ পর্যন্ত এমন কথা কেউ বলে নি।

—আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না। এটা আমার খুবই ব্যক্তিগত একটা ইচ্ছে।

তিনি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। রিকশায় সারাটা পথ তাঁকে নিঃশব্দ দেখেছিলাম। কোলের ওপর হাতদুটি জড়ো করে তিনি এমনভাবে বসেছিলেন, এমনভাবে ঠোঁট নাড়ছিলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি বোধহয় প্রার্থনার মতো কোনো দুরূহ কাজে আত্মময় আছেন।

সুজনদা শহরে ছিল না। তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়েছিলাম আমরা চারজন—মাসিমা, অপর্ণা, শোণিমা এবং আমি। তাঁর সামনে আবরণমুক্ত হারমোনিয়াম। তিনি সেদিন অনায়াসে শব্দ করতে-করতে খুলে দিয়েছিলেন কয়েকটি মনোদরজা। কিংবা বলা যায় অপর্ণার প্রতি আমার যে মন তাকে তিনি সুরের অবলম্বন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুল যখন থামল কাউকে কিছু বলতে হল না, কেউ বাধাও দিতে পারল না। অপর্ণা উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করল। সেই সন্ধেরাতে তিনি এই প্রণাম নিতে গিয়ে হাতজোড় করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

এই সন্ধেরাতের কান্নার পর থেকে অপর্ণাদের বাড়িতে যাওয়া আমার নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে যায়। আমি গিয়ে প্রথমে জেনে নিই অপর্ণা ভোরে উঠে ছাদের ঘরে গিয়ে রেওয়াজ করেছে কিনা। এমন খুব কম দিনই পেয়েছি যখন শুনতে হয়েছে—না, আজ ও ভোরে উঠতে পারে নি। শরীর খারাপ ছিল। কোনো-কোনো দিন এমন হয়েছে সন্ধের দিকে সে আমাকে নীচে বসিয়ে রেখে ছাদে রেওয়াজ করতে চলে গেছে। আমি হয়তো শোণিমার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে কোনো কাজে বেরিয়ে পড়েছি। অপেক্ষা করাটাকে মনে হয়েছে অতিরিক্ত কিছু। অন্তত দুদিন এইভাবে বেরিয়ে পড়ে লক্ষ করলাম অপর্ণাদের বাড়ির কাজের মেয়েটি তাদের বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে একটু সচেতন হয়ে কী সব নীচু স্বরে বলে যাচ্ছে। তার শ্রোতাদের মধ্যে আমি যে মেয়েটিকে চিনতে পারলাম সে তখন কিছু-দিন হল আমাদের বাড়িতে বাসন মাজছে, কয়লা ভাঙছে, ঘর মুছে দিচ্ছে এবং খাবার জল নিয়ে আসছে। পিসিমার মৃত্যুর কিছুদিন বাদে শোভা কাজ ছেড়ে দেবার পর থেকে বহু মেয়েকে আমাদের বাড়িতে আসতে এবং যেতে দেখা গেছে। এমন মেয়েও এসেছে যে ঠিক তিনদিন কাজ করে তার পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। এই অস্থিরতার কোনো-কোনো পর্ব খুবই কষ্টের ছিল। মাকে তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে এমন সব কাজ করতে হত যা করাটা তাঁর পক্ষে শুধু ক্ষতিকারক নয়, অশোভনও। মা কয়লাঘর থেকে বেরিয়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরঘরে গেলে আমার অন্তত মনে হত মাকে সবই করে যেতে হচ্ছে করে যাওয়া দরকার বলে। করার আনন্দে যা করে ওঠা যায় তেমন কোনো কাজ মার প্রায় নেই। তখনই অপর্ণাদের সীতার দ্বারা মা গীতাকে পেয়ে যান। আমাদের খাদ্যতালিকার প্রতিটি খাদ্য গীতা যাতে দুপুরে পেতে পারে মা তার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং প্রায়ই সার্থক হয়ে যান। গীতা সারাদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সূর্যাস্তের পর বস্তির পথ ধরত। বাড়িতে কোন আত্মীয়সমাগম হলে বা কোনো উৎসবের বাতাস বয়ে গেলে এমনও হয়েছে সন্ধের অনেক পরে তার রাতের খাওয়া সেরে সুপুরি মুখে দিয়ে গীতা বাড়ি ফিরে গেছে। যুটযুটে বিকেল-গুলোতে আমাদের বারান্দায় মা তাকে নিয়ে বসতেন। মা তাঁর চুল ছেড়ে দিতেন। সেই খোলা চুলকে পরিষ্কার করে একটি রূপে আবদ্ধ করার দায়িত্ব নিত গীতা। মায়ের পেছনে বসে কাজ করতে-করতে মায়ের পেছনের দিনগুলির অনেক কথাই ক্লান্ত না হয়ে শুনে যাবার ক্ষমতা তার ছিল। মাও শুনতেন অসীম ধৈর্য

নিয়ে তার সামনে বসে তার সামনের দিনগুলিকে নিয়ে তার যত জল্পনা-কল্পনা। একজনের অতীত এবং অন্যজনের ভবিষ্যৎ-চর্চার মাঝখানে একজনের ভবিষ্যৎ এবং অন্যজনের অতীত এসে পড়ত এবং সেই সমাগমের আলোয় বর্তমানের যে মুখটি ফুটে উঠত তা তুচ্ছ করার মতো মনোবল কোনো পক্ষেরই ছিল না। ফলে আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মাঝে-মাঝে বুঝতে পারছিলাম মার পেছনে এবং গীতার সামনে যে নীরবতার বিরাজ ঘটছে তা বড়ো বানানো এবং তা বড়ো আকস্মিক। আর সীতা মার সঙ্গে গীতার পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য যেদিন বিকেলে এসে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করেছিল সেদিনের পর বহুদিন ধরে তাকে আমি আমাদের বাড়িতে দেখতে পাই নি। কিন্তু বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে তার সেই চাপাস্বরে কথা বলার পরে খুব একটা দেরি হয় না, তাকে একদিন আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সন্তর্পণে।

সে-বছর বাংলা মতে আমার জন্মতারিখ ছিল না। সে-বছর আমার জন্মমাসটি বত্রিশ দিনের বদলে একত্রিশ দিনে শেষ হয়েছিল। তবু ইংরেজি তারিখটিকে সম্বল করে একটি পার্বণের স্বাদ এর আগেও কয়েক-বার আনা হয়েছে। এইসব দিনগুলিতে আমার দিক থেকে সাধারণত মা-বাবার পদস্পর্শ করার একটা প্রেরণা থাকে এবং মা-বাবার দিক থেকে আমার মস্তকস্পর্শের দায়িত্ব থেকে যায়। এইসব দিনগুলিতে আমি যখন বাবার পদস্পর্শ করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঘরটিতে প্রবেশ করি, বাবা জানলার পাশের চেয়ারে একটু আগে নিক্ষিপ্ত খবরের কাগজ মেলে ধরে বসে থাকেন। তাঁর ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত থাকে। তিনি যৌবনে বহু দূরের অনাবৃত ঊর্ধ্বের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চার দিকে বিরাজ করত অদ্রি, বনানী ও নদীর সব-স্বেচ্ছাচার। সেই তাকিয়ে থাকার কোনো শেষ থাকত না এক-একদিন। এক-একদিন তাকিয়ে থাকার আগেই শর্বরীকে দিবালোকিত করে দিত ওপর থেকে নেমে আসা বিমানের আলো এবং আলোর সূত্র ধরে শুরু হত শব্দের প্রলয়। প্রলয়ের শেষে বড়ো কোনো বিবরের মধ্য থেকে উঠে এসে তাঁর সজল চোখ এক-এক করে আবিষ্কার করত বন্ধুদের মৃতদেহ। শায়িত বন্ধুদের ফেলে রেখে তাঁকে বহুবার এগিয়ে যেতে হয়েছে। একবার আদ্যন্ত অন্ধকারে তিনি এক পারাপারের নৌকোতে পা রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি যাবার আগেই নৌকো তাঁর কিছু সতীর্থের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নৌকোতে উঠতে গেলে মাঝি রাজি হতে গিয়েও কী ভেবে পিছিয়ে যায়। তাঁকে নৌকোর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। সে নৌকো আর ফেরে নি। মাঝ-নদীতে বাবার চোখের সামনে তার জলসমাধি ঘটে। বাবা সেদিন ওই নৌকোয় পা রাখলে আমি জন্মদিনের সকালে খোলা জানলার পাশে পাঠরত বাবার পায়ে হাত রাখতে পারতাম না। প্রতিবার বাবা পায়ে হাত রাখলে আমার মাথায় হাত রেখে জয়ধ্বনি দিতেন। অন্তত তিরিশ সেকেনডের জন্য আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আলিঙ্গনের পর দিনের কোনো এক সময়ে তাঁকে আমি যেভাবেই হোক পুরোনো দিনের ঝাঁপির সামনে এনে দাঁড় করাতাম। আর তিনি গতিময় সাপুড়ের সমস্ত গুণ নিয়ে ঝাঁপির ঢাকা খুলে বের করে আনতেন এক-একটি নাগমুহূর্ত। তিনি দক্ষিণের জমির কথা বলতেন। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে তিনি বুঝলেন দেশ ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে দক্ষিণের সব উর্বর মৃত্তিকা। বড়ো শহরের পথে দেখা হল পিটারের সঙ্গে। সেই দীর্ঘদেহী তাঁকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জেনেছিলেন। পিটার তাঁকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন এমন এক অফিসে যেখানে দুর্গম সব নদীর সেতুবন্ধন নিয়ে রাতদিন কাজ চলছে। বাবা আমাকে বলেছিলেন কত আশা নিয়ে তাঁর অফিসে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল এক স্বপ্নচারী নমঃশূদ্র। যে-জমি ছেড়ে চলে

আসতে হবে সেই জমির বিনিময়ে সে তাঁকে দিতে চেয়েছিল অর্থের একটি উজ্জ্বল অঙ্ক। কিন্তু বাবা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন অন্তত শেষ মুহূর্তে এমন কোনো ঘণ্টা বেজে উঠবে যা ছুটির ঘণ্টা নয়, যা দক্ষিণের জমি নিয়ে বেঁচে থাকার ঘণ্টা। "সেই টাকা যদি তখন নিয়ে নিতাম আজ কত কিছু হয়ে যেত"—এই অনুতাপের বাক্যটি তুলে রেখে বাবা ঝাঁপির মুখ বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু বত্রিশ দিনের বদলে একত্রিশ দিনে শেষ হওয়া সেই জন্মমাসের বছরে ইংরেজি তারিখের সূত্র ধরে আমি সবচেয়ে বড়ো ঘরে গিয়ে সকালের খোলা জানালার পাশে পাঠরত বাবাকে পেলাম না। তাঁকে পেলাম সবচেয়ে ছোটো ঘরের ঘাটে শায়িত অবস্থায়। তাঁকে ডেকে তুলে তাঁর পদস্পর্শ করলে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে-ছিলেন ঠিকই। কিন্তু কোনো আলিঙ্গন ছিল না এবং জয়ধ্বনির বদলে উচ্চারিত হল, 'ঈশ্বর তোমাকে শুভ বুদ্ধি দিন।'

জন্মদিনের সকালে মার পায়ে হাত রাখার জন্য আমি যে-ঘরটিতে চলে যেতাম সেখানে একদিকে সিংহাসন এবং অন্যদিকে অগ্নিপরিধি। মা উনুনে কিছু বসিয়ে দিয়ে সিংহাসনের সামনে গিয়ে বসে পড়তেন। হাতে ভিজে কাপড় নিয়ে সিংহাসন থেকে তুলে এনে তিনি পাথর কাঁচ ও কাঠের নানা আঙ্গিক পরিমার্জিত করে যেতেন। পরিমার্জনার পর চন্দন বানিয়ে নিয়ে অনুলেপনের কাজ করতে-করতে তাঁকে আবার অগ্নিক্ষেত্রে ফিরে যেতে হত। এই ফিরে-যাওয়া এবং ফিরে-আসার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসত ধূপের গন্ধ, সিংহাসনজোড়া স্নিগ্ধতা, নানা মরসুমি সবজির সিদ্ধি ও হলুদে ডোবা মীনপুচ্ছ। পারাপারের মাঝখানে মাকে আমি ধরে ফেলতাম ঠিক। পদস্পর্শ করে মাথা তোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমার চিবুক ছুঁয়ে মা আমার মাথায় রাখতেন কৌটো থেকে তুলে আনা ধান। যখন ভাত খেতে বসতাম তিনি ভাতের থালার পাশে যে বাটি রেখে থাওয়া শুরু করার আগে তার থেকে অনুপরিমাণ কিছু তুলে নিয়ে উদ্বোধন করার কথা বলতেন তা ধারণ করত ঘনীভূত পায়েস। আমার উদ্বোধন করার কাজ না দেখে মা স্থানত্যাগ করতেন না। কিন্তু তাঁকেও ছেড়ে আসতে হয়েছিল পায়েস-প্রমাণ শুভ্রতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটি অন্দর, তাঁর পিতাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে আসার মতো শক্তি, পায়ে আলতা পরে জলটুঙি ছুঁয়ে আসার মতো অবাধ্যতা। মধ্য যৌবনে মুছে যাওয়া তাঁর পিতার কপালের ভাঁজ তিনি আমার কপালে খুঁজে পেয়ে একই সঙ্গে শঙ্কিত ও সানন্দ হতেন। জন্মদিনের সকালে আমার মাথায় তাঁর অবারিত হাত সেই শঙ্কা ও আনন্দের একটি সমবায় হয়ে ফুটে উঠত। সেদিন যখন আমি নত হয়ে পায়ে হাত রাখতে গেলাম তিনি পা-কে বিচলিত করে বাধার সৃষ্টি করলেন এবং প্রণাম শেষ হবার আগেই তিনি আমার মাথায় হাত রাখতে চেয়েছিলেন সবিস্তারে। এক হাতের বদলে দুহাত মাথায় রেখে মা বলতে পেরে-ছিলেন—মাগো, একে ডাইনির হাত থেকে বাঁচাও। রক্ষা করো, রক্ষা করো। [ক্রমশ

অকটোবর সংখ্যায় এই রচনাটিতে তিনটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে।

(১) পৃ ৪৯১, লাইন ২৮, শুদ্ধরূপ 'কর্মস্থানের'। (২) পৃ ৪৯২, ১ম কলম, লাইন ৫, 'হয়ে' শব্দটি বাদ যাবে। (৩) পৃ ৪৯৫, ২য় কলম, লাইন ১৫, শুদ্ধ রূপ 'ছুটির'।

ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ

অমলেন্দু দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের সূচনা হলেও, প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম দিকে সিন্ধু আর পনজাব এবং পূর্ব দিকে বর্মার দক্ষিণ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশাল অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা দেয় কৃষক, কারিগর, আদিবাসী এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে। তাঁরাই প্রথমে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন এই-সব শ্রেণীর এবং সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ।[১] তারপরে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের মধ্যে একটি অংশ সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন, আর-একটি অংশ নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বায়ত্তশাসন অর্জনে প্রয়াসী হন। দুটো ধারাই স্পষ্ট ছিল : সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা, এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা।[২] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত মুসলিম সমাজেও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় মুসলিম সমাজের উন্নতিসাধনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রেখেই তাঁরা সমাজের উন্নতিসাধন করতে প্রয়াসী হন।[৩] ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অহিংসা নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে আর-একটি স্রোতোধারা সৃষ্টি করেন। প্রায় একই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের আর-একটি ধারার প্রবর্তন করেন।[৪] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়।[৫] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের তিনটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল : (ক) জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা ; (খ) মহাত্মা গান্ধী -পরিচালিত অহিংসানীতি-নির্ভর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ; (গ) কমিউনিস্ট পার্টি -পরিচালিত মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা। মুসলিম লীগ -পরিচালিত আন্দোলনের ধারাটি ছিল স্বতন্ত্র।

উল্লেখ্য এই, ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম-, ভাষা ও জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করায় এবং আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিক্রিয়া একই রকম হয় নি ; বিভিন্ন সময়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটেই এই প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম সমাজের অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে কাঠামোর মধ্যে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা হল : (১) ঔপনিবেশিক ভারতে দ্বন্দ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; (২) জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন (১৮৭৬—১৯৪৭) ; (৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা (১৮৮৫—১৯৪৭) ; (৪) কমিউনিস্ট পার্টি -পরিচালিত আন্দোলন (১৯২০—১৯৪৭) ; (৫) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া (১৮১৮—১৯৪৭)। বলা বাহুল্য, বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে খুবই সংক্ষেপে আমি শুধু কয়েকটি মূল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আলোচ্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এই সময়কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আন্দোলনে ধর্মের একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে এক সম্প্রদায় কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলন অন্য সম্প্রদায়ের নিকট ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসননীতির ফলে সমাজের মধ্যে অসমান অগ্রগতি হওয়ায় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে বিষয়টির তথ্য-নির্ভর বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(১) ঔপনিবেশিক ভারতে দ্বন্দ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতে দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের যে ক্ষেত্রটি তৈরি হয় তাতে একদিকে ছিল ভারতীয় জনসাধারণ, অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণীর অবস্থানে পার্থক্য দেখা দেয়। কৃষক আর জমিদার এবং শিল্পপতি আর শ্রমিক ব্রিটিশ শাসনের অধীনে পরাধীন জীবন-যাপন করলেও তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ভিন্ন ছিল। স্বভাবতই এখানেও একটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ক্রমপ্রসারিত হয়। উপরন্তু নানা ধরনের সামাজিক সংগ্রামও ভারতীয় জীবনধারায় আলোড়নের সৃষ্টি করে, আর তা ধর্ম-সম্প্রদায়গত বৃত্তের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, এক ধর্মসম্প্রদায়গত বৃত্তের সঙ্গে অন্য ধর্মসম্প্রদায়গত বৃত্তের বিরোধও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের মনোভাবকে স্পষ্ট করে তোলে। সুতরাং শ্রেণী দাবি (class demands) এবং শ্রেণী অথবা সামাজিক সংগ্রাম (class or social struggles) ঔপনিবেশিক ভারতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটিকে আমরা প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত করতে পারি : (ক) মুখ্য বা প্রধান বিষয় হল ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ, এবং (খ) গৌণ বা অপ্রধান বিষয় হল শ্রেণী অথবা সামাজিক সংগ্রাম। প্রশ্ন হল : মুখ্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও গৌণ বিষয়টি সম্বন্ধে কী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা হবে ? পরাধীন দেশের জাতীয় সংগ্রামে এই প্রশ্নটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্য উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ধ্বংস করে জাতীয় মুক্তি অর্জন। এই প্রধান উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য গৌণ বিষয়গুলো সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা জনসাধারণের থাকা

প্রয়োজন। তাহলেই ব্যাপক জনশক্তির সহযোগিতায় মুখ্য উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় এবং পরিবর্তিত অবস্থায় সামাজিক সংগ্রামকেও পরিণত রূপ দান করা সম্ভব হয়। সুতরাং দ্বন্দ্বের দুটো ক্ষেত্রেই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; মুখ্য এবং গৌণ দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সামঞ্জস্য সাধনের ওপরই স্বাধীনতা ও সামাজিক সংগ্রামসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভবপর। ভারতেও জাতীয় আন্দোলনের সামনে অন্যতম সমস্যা ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী-দাবি এবং শ্রেণী অথবা সামাজিক সংগ্রামগুলোকে integrate বা পূর্ণাঙ্গ করে তোলা। সুতরাং একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করলে এই সময়কার ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সমস্যা তো এই নয় যে, একটিকে আর-একটির বিরুদ্ধে উল্লেখ করা। মূল বিষয় হল পরস্পরের যোগসূত্রকে উদ্ধার করা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী বা সামাজিক সংগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করার প্রয়াস করা এবং ধারণাকে স্বচ্ছ করা। এখানে ধ্রুপদী মার্কসবাদী ধারণা আমাদের বিশ্লেষণকে স্বচ্ছ করে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হবে বলে মনে করি। ভারতের জনসাধারণের করণীয় কাজ ছিল জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করা, সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করা নয়। কারণ, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ছিল বিদেশী মূলধনের আধিপত্য; কোনো ভারতীয় মূলধনী বা সামন্তশ্রেণীর শাসন এখানে ছিল না। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শ্রেণীসংগ্রামকে উচ্চ সামগ্রিক বিরোধের পর্যায়ে না নিয়ে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের শ্রেণীগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে একে অপরকে কিছু সুযোগ দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে সুদৃঢ় করাই ছিল প্রধান বিষয়। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে 'মুখ্য' ও 'গৌণ' বিষয় মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও জেদং যেভাবে বিশ্লেষণ করেন, তা ভারতের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটটি বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস ঔপনিবেশিক প্রশ্ন আলোচনায় উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।[৬] মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই 'আইরিশ প্রশ্নের' প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; আয়ারল্যানডের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা ইংরেজ প্রোলেতারিয়েতকেও সক্রিয়ভাবে আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করতে আহ্বান জানান। ইংরেজ প্রোলেতারিয়েতের সামাজিক মুক্তি অর্জনের জন্যই তা প্রয়োজন।[৭] ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেলস আইরিশ শ্রমিকদের বলেন, তাদের অন্যতম কাজ হল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা।[৮] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেলস এই কথাও বলেন, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন আয়ারল্যানড ও পোলানড, এই দুই জাতির অধিবাসীদের আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ার পূর্বে জাতীয়তাবাদী হওয়াই কর্তব্য।[৯] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেলস আরও বলেন, একটি বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে জাতীয় সংগ্রাম এবং কৃষি-বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।[১০] মার্কসের অনুরোধে এঙ্গেলস পোলানড সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে এঙ্গেলস পোলানডে স্বাধীনতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।[১১] লেনিনও ঔপনিবেশগুলোর স্বাধীনতার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পোলানডের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্ন নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাতেও লেনিন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেন।[১২] তাছাড়া লেনিন আইরিশ প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নীতির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেন, জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে নিপীড়িত জাতিসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর এই নীতিই অনুসরণ করা উচিত।[১৩]

পরবর্তী কালে মাও জেদং চীন বিপ্লবের নীতি ও কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন, এবং চীন বিপ্লবের পথ নির্দিষ্ট করেন। তিনি চীনের সমাজে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করে বলেন, 'চীনের বর্তমান সমাজে একটি প্রধান দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও চীনজাতির ভিতরে এবং আর-একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে চীনের সামন্ততান্ত্রিক ধ্বংসাবশেষ ও জনসাধারণের ভিতরে (অবশ্য আরও অনেক দ্বন্দ্বই আছে, যেমন বুরজোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে, চীনের শাসক শ্রেণীর ভিতরে ইত্যাদি)। এইসব দ্বন্দ্বের ভিতরে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব হল সাম্রাজ্যবাদ ও চীন জাতির ভিতরে।'[১৪] কিন্তু মাও বলেন, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সামরিক বল প্রয়োগ করে সমগ্র চীন দখল করার জন্য আক্রমণ শুরু করে, তখন থেকে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ হল চীনের প্রধানতম শত্রু। তিনি বলেন, যুক্ত ফ্রন্টের মূল নীতি হল জাপানকে প্রতিহত করা। তাই বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের অধীনে শ্রেণীসংগ্রামকে রাখা কর্তব্য।[১৫] মাও লেখেন, জাপবিরোধী যুদ্ধের সময়ে জাপানকে প্রতিরোধ করাই হল মুখ্য বিষয়। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধের স্বার্থের যেন কোনো সংঘাত না ঘটে; প্রতিরোধযুদ্ধের স্বার্থের অধীনেই থাকবে শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থ। শ্রেণী-সমূহ এবং শ্রেণীসংগ্রাম রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসা প্রয়োজন। পারস্পরিক সাহায্য ও সুবিধাদানের নীতি কেবলমাত্র বিভিন্ন দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য এমন একটি উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণীসম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়; শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের জন্য একদিকে যেমন শ্রমজীবী মানুষকে রক্ষা করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে ধনীদের স্বার্থের কথাও বিবেচনা করতে হবে। শুধু এক অংশের কথাই ভাবা আর অন্যের কথা ভুলে যাওয়া প্রতিরোধযুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।[১৬] মাও আরও লেখেন, যে জাতি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সেখানে শ্রেণীসংগ্রামও জাতীয় সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। একদিকে যেমন শ্রেণীসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিসমূহ জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের সহযোগিতাকে ভেঙে না ফেলে তা দেখা উচিত, অন্যদিকে শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্ত দাবিই জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয় শর্ত অনুযায়ী শুরু করা উচিত। এইভাবেই জাতীয় সংগ্রাম এবং শ্রেণীসংগ্রাম সঙ্গতিপূর্ণ হয়।[১৭]

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্যসাধন বা তাদের দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছিল তা দেখা দরকার। অর্থাৎ কার্যত কিভাবে এবং কতটা জাতীয় আন্দোলন সামাজিক শ্রেণীসংগ্রামের সমাধান এবং শ্রেণীসমঝোতা অর্জন অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাতে জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র বোঝা সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে চীন, ভিয়েতনাম এবং আফ্রিকার পর্তুগীজ ঔপনিবেশগুলোর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের তুলনামূলক আলোচনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে সহায়ক হয়।

(২) জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন (১৮৭৬—১৯৪৭)

ইংরেজিশিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত-পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংগঠিত রূপ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লক্ষ করা যায়; আর তার সূত্রপাত করেন মহারাষ্ট্রের বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে। এই আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু।[১৮] খুব সঠিকভাবেই বিপ্লবীরা ঔপনিবেশিক ভারতের প্রধান শত্রুকে অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেন। তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম যুগে (১৮৭৬—১৯১০) বিপ্লবীরা এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের জন্য প্রয়াসী হলেও হিন্দু বৃত্তের বাইরে তাঁদের চিন্তাকে বিশেষ প্রসারিত করতে পারেন নি। তাঁরা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ণ

স্বাধীনতা অর্জনের' অর্থেই 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম মুখ্য বিষয় হলেও, শ্রেণী অথবা সামাজিক সংগ্রামগুলোর মতো গৌণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা থাকলে ভারতের মতো দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যোগসূত্রের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হত। কী করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী বা সামাজিক সংগ্রামকে integrate বা পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে কোনো ভাবনা অরবিন্দ ঘোষের মতো বিখ্যাত নেতার রচনায় বা কার্যাবলীতে মেলে না। এমনকি, তাঁর মতো একজন যোগ্য নেতার পক্ষে ভারতের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের উদারনৈতিক-মানবিক ধারাটির সংযোগসাধনও সম্ভবপর হয় নি। তিনি বিভিন্ন ধর্মের আর ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ রেখে নবশক্তির উন্মোচন করে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের একই প্রাঙ্গণে সমবেত করে আন্দোলনের গণভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন নি। প্রভূত শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অরবিন্দ ঘোষ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের জন্য একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচী তৈরি করতে পারেন নি। এই সীমাবদ্ধতা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য জাতীয়তাবাদী অথবা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতাদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। এই দুর্বলতা ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্যতম দুর্বলতা।[২৯] জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় (১৯১১—১৯১৯) ও তৃতীয় (১৯২০—১৯২৩) পর্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাইরে বিপ্লবীরা জনসাধারণের সক্রিয় যোগদান ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তৎপর ছিলেন। অকটোবর বিপ্লবের পর বহু হিন্দু ও মুসলমান বিপ্লবী সোভিয়েত দেশে যান। তাঁরা সোভিয়েত সরকারের সমর্থন করলেও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে' গ্রহণ করেন নি; তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের পরিবর্তে সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করার কথা চিন্তা করেন।[৩০] বিপ্লবীদের মননে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব থাকলেও তাঁরা একসঙ্গে ভারতের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ করেন। কোনো সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস, বর্মায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং কাবুলে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার স্থাপনের কথা উল্লেখ করা যায়।[৩১] প্রসঙ্গত, সোভিয়েত রাশিয়ায়, জারমানিতে এবং আমেরিকায় বিপ্লবীরা যে ভূমিকা পালন করেন তাও লক্ষণীয়।[৩২] চতুর্থ (১৯২৪—১৯৩৪) এবং পঞ্চম (১৯৩৫—১৯৪৭) পর্যায়েও বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক ভাবনাচিন্তারও প্রসার ঘটে।[৩৩] অবশ্য প্রথম যুগেও অর্থনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে কানাডার মতো সংবিধান প্রবর্তনের কথা বিপ্লবীরা বলেন। বিপ্লবীদের প্রচারিত ইস্তাহারে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে জমিদারদের সতর্ক করে দেওয়ার তথ্যও পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ পুরোহিত ও মৌলানারা যাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করতে না পারেন তার জন্য বিপ্লবীরা তাঁদের সতর্ক করে দেন।[৩৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণীসমূহের বা সম্প্রদায়গুলোর সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নি। 'হিন্দু বিপ্লবীদের' মধ্যে যেমন 'হিন্দু মানসিকতা' কমবেশি প্রচ্ছন্ন ছিল, তেমনি 'মুসলমান বিপ্লবীদের মধ্যেও 'মুসলিম মানসিকতা'র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।[৩৫]

রাসবিহারী বসু ভারতে 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠিত করতে উদ্যোগী হন। তাহলেও তাঁরা শ্রেণী অথবা সামাজিক সংগ্রামগুলো সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট কার্যক্রম ব্যক্ত করেন নি। দুজনেই স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতা অর্জনের ওপর

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের ধারণা ছিল, স্বাধীনতা অর্জিত হলে অন্যান্য গৌণ বিষয়গুলোর সমাধান সহজেই করা যাবে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে গৌণ বিষয়গুলো জটিলরূপ ধারণ করে মুখ্য বিষয়ে সাফল্য অর্জনের পথে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও স্বচ্ছ ছিল না।[৩৬] অথচ প্রায় একই সময়ে মাও জেদং চীনে 'ম্যাহোমেডান ব্রিগেড' গঠন করতে সক্ষম হন, সংখ্যাগুরু হ্যান জাতির লোকদের সঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মৈত্রী গড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে চীনের বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।[৩৭]

(৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা (১৮৮৫—১৯৬৭)

জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা কয়েকটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যায়: (ক) ১৮৮৫—১৯১৬; (খ) ১৯১৭—১৯৩০; (গ) ১৯৩১—১৯৩৬; (ঘ) ১৯৩৭—১৯৪৭। প্রথম স্তরে কংগ্রেস শ্রেণীসংগ্রামের সমস্যা উপেক্ষা করে এবং এই সংগ্রামকে মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সমযুক্ত করার প্রতি অবহেলা করে। কংগ্রেস বিষয়টিকে যেভাবে দেখে তা সংক্ষেপে এইভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যায়: একদিকে হল ভারতের স্বার্থ, অন্যদিকে হল উপনিবেশবাদ। এই যুগে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্দশা ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলেন; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন।[৩৮] ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেমবর মাসের পূর্বে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন নি।[৩৯] ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল মহাত্মা গান্ধী 'স্বরাজ' শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও করেন নি। স্বভাবতই দ্বন্দ্বের মুখ্য বিষয়টি জনসাধারণের কাছে স্বচ্ছ হয় নি, অন্যদিকে গৌণ বিষয় সম্বন্ধেও ধারণা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।[৩০]

দ্বিতীয় স্তরে শ্রেণী প্রশ্নগুলোর প্রতি কংগ্রেস দৃষ্টি দেয় এবং সচেতনভাবে শ্রেণীবিরোধ-মীমাংসার নীতি গ্রহণ করে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করেন। তিনি উত্তর বিহারের চম্পারণে (১৯১৭), গুজরাটের কয়রাতে (১৯১৭—১৯১৮) ও আমেদাবাদে (১৯১৮) যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন তাতেই কংগ্রেসের এই ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায়। এইসব আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসমাজ ও শ্রমিকশ্রেণীর সংযোগ ঘটে।[৩১] ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টি বাংলার 'টেনানসি বিল' আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষক ও জমিদার উভয়ের স্বার্থরক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।[৩২] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী জমিদার ও কৃষকদের বিরোধ মীমাংসার জন্য মত ব্যক্ত করে বলেন, জমিদারদের ৫০% খাজনা মকুব করা উচিত, এবং কৃষকদের বাকি খাজনা দেওয়া উচিত।[৩৩] কিন্তু গান্ধীজীর প্রচেষ্টা কৃষকদের ঋণের বোঝা প্রশমিত করার সঙ্গে যুক্ত ছিল না।[৩৪] বলা বাহুল্য, জমিদাররা তাঁর আবেদনে সাড়া দেন নি। অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষকদের একাত্মতা বৃদ্ধি পায় এমন কোনো নীতি কংগ্রেস অবলম্বন করতে সক্ষম হয় নি। ভূমিসমস্যাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বিত করে কৃষকদের উদ্দীপ্ত করার কোনই পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারে নি। উপরন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বে জমিদারদের প্রভাব থাকায় তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনো কার্যক্রম কংগ্রেস গ্রহণ করে নি।[৩৫]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে চিত্তরঞ্জন দাস ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে এক জটিল মনোভাব প্রদর্শন করেন। তিনি একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেসকে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠন করতে বলেন। চিত্তরঞ্জন শ্রেণীসমূহের বিরোধ দূর করে সমন্বয়সাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে মূল জাতীয় স্বার্থের সঙ্গতি সাধন করে বহু শ্রেণীর সহযোগে এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।[৩৬] শ্রেণীসমন্বয়ের কাঠামোর মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার কথা আরও অনেক কংগ্রেস নেতা বলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে মোতিলাল নেহেরু যে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হল, শ্রমিক ও মালিকের এবং জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য কংগ্রেস গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।[৩৭] ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে মোতিলাল নেহরু সরকারের সমালোচনা করেন এই কারণে যে, সরকার সাম্যবাদ-বিরোধিতার নামে মালিকদের সমর্থন করছে, শ্রমিক-দের গুলি করছে এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি কংগ্রেস নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না এবং শ্রমিকের ন্যায্য দাবি রক্ষার জন্য কংগ্রেসকে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে। জাতীয় সংহতির অংশ হিসেবেই কংগ্রেসকে শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে।[৩৮]

তৃতীয় স্তরে কংগ্রেসের তিনটি অধিবেশনে (১৯৩১, ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রেণীসমন্বয়ের, শ্রমিক ও কৃষকের সামাজিক অবস্থার উন্নতির এবং তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামসমূহ পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[৩৯] এই সময়ে গান্ধীজীরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। গান্ধীজী শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা বললেও 'চাষীর হাতে জমি দাও' নীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।[৪০] প্রশ্ন হল: কী কারণে এইসব কর্মসূচী কার্যকর হল না? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়।

চতুর্থ স্তরে কংগ্রেসের মধ্যে এই দুই অংশের বিরোধ ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে সহায়ক যেসব প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করে তা দক্ষিণ-পন্থীরা কার্যকর হতে দেন নি। তাঁরা জাতীয় ঐক্যের নামে শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামশীলতাকে বাধা দেন, শ্রেণীসংগ্রামকে জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়রূপে উল্লেখ করেন। কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী অংশের পক্ষে এইসব কর্মসূচী কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিহারে কংগ্রেসের ভূমিকা উল্লেখ করা হল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহার সরকার যে 'খাজনা আইন' (Rent Act) পাশ করে তাতে খাজনা বাকির দায়ে কৃষকদের শস্য ক্রোক করবার অধিকার জমিদারদের দেওয়া হয়।[৪১] জমি-দারদের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসের ভিত্তিতেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই বিহার কংগ্রেস 'কিষাণ সভার' সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিষাণ সভা-পরিচালিত সংগ্রামশীল আন্দোলনের বিরোধিতা করে। গান্ধীজীও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হরিজন' কাগজে স্বামী সহজানন্দ-পরিচালিত কৃষকদের সংগ্রামশীল আন্দোলনের সমা-লোচনা করেন।[৪২] একই সময়ে সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের রাজনীতিকে জটিল করে তোলে। ভারতীয় বুরজোয়ারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কংগ্রেস শ্রেণীসংগ্রামের এবং সম্প্রদায়গত বিরোধের মীমাংসা করে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে নি। এমনকি, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরিস্থিতি অনুকূল ছিল তখনও কংগ্রেস জন-সাধারণের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্য-বাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার পথটি বর্জন করে।[৪৩]

(৪) কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলন (১৯২০-১৯৪৭)

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে ও তার পরিচালিত আন্দোলনে মুসলমান যুবকদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাসকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ায় অবস্থানকারী ভারতীয় মুহাজির যুবকদের কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার আগেই মুহম্মদ আলি, আবদুল মজীদ ও মুহম্মদ শফীক নিজেদের কমিউনিস্ট বলে মনে করতেন এবং তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন।[৪৪] শওকত উসমানী সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিস্ট হন। তাঁরা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সাম্যবাদের কোনো বিরোধ দেখতে পান নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রভাবেই তাঁরা সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরা কোরানের সমতাবাদের আদর্শের (egalitarian principles) সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের সঙ্গতি দেখতে পান। শওকত উসমানী লেখেন: 'ইসলাম সাম্য প্রচার করে এবং সাম্যবাদও তাই করে। এই কারণে আমি একজন কমিউনিস্ট।'[৪৫] শুধু প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রেই এইসব মুসলমান যুবকদের দান ছিল না, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতে ফিরে এসেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সূচনাপর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী মুসলমান যুবকেরাই মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সমবেত প্রয়াসে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত হয়।[৪৬] স্বভাবতই, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগত বৈশিষ্ট্য বিপ্লবী দল, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ অবলম্বন করেই কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন সংগঠিত করে। কমিউনিস্ট পার্টি কতটা সঠিকভাবে লেনিন-রচিত 'থিসিস' প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়; কেন পার্টি চীনের অথবা ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির মতো ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নি, এইসব বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমি সংক্ষেপে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকটা প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করছি।[৪৭] কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে integrate বা পূর্ণাঙ্গ রূপদানের চেষ্টা করে, কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের সামঞ্জস্যসাধন করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে চেষ্টা করে। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য, তাই ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকবার কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণস্বাধীনতার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করতে আবেদন জানায়।[৪৮] তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারিপ্রথা অবসানের দাবিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে কৃষকসমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় মুক্তি-সংগ্রামকে সফল করতে উদ্যোগী হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে কমিউনিস্টরা একটি প্রস্তাবে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব পরাজিত হয়।[৪৯] জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কর্মপন্থা কংগ্রেস গ্রহণ করে নি।[৫০] কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক কারণসমূহকে সাম্প্র-দায়িক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করে, জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের দাবি করে এবং এইভাবে সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষ দূর করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন নি।[৫১] হিন্দু-মুসলিম ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিরোধ-মীমাংসার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় রাষ্ট্রের গড়ন সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করে তাও লক্ষণীয়। ১৯৪২

খ্রীষ্টাব্দের ৮ অগস্ট ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় কমিউনিসট পার্টি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৫২] কমিউনিসট পার্টি মনে করে, ভারতবর্ষ হল সতেরোটি স্বাধীন জাতির এক পরিবার। 'ভারতবর্ষ হল একটি জাতি'—কংগ্রেসের এই চিন্তাকে যেমন কমিউনিসট পার্টি গ্রহণ করে নি, তেমনি মুসলিম লীগের তত্ত্ব 'মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি'—এই তত্ত্বকেও কমিউনিসট পার্টি গ্রহণ করে নি। কমিউনিসট পার্টির মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারসহ এই সতেরোটি সার্বভৌম জাতির স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করলে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপ বজায় রাখা সম্ভব হবে।[৫৩] কিন্তু কংগ্রেস এবং লীগ এই বক্তব্য গ্রহণ করে নি। ভারতের রাজনীতিতে মৌলবাদী চিন্তার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় একসঙ্গে চলার পথটি সংকুচিত হয়। সম্প্রদায়গত বিরোধের ক্ষেত্রটি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ে; হিন্দু ও মুসলিম মানসিকতা স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রকট করে তোলে। তাকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা কমিউনিসট পার্টির ছিল না।[৫৪]

(৫) ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া (১৮১৮—১৯৪৭)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়াকে প্রধানত দুটো স্তরে বিভক্ত করা যায়: (ক) ১৮১৮-১৮৫৮: ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন এবং ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ; (খ) ১৮৫৮-১৯৪৭: মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মতত্ত্ববিদ -পরিচালিত আন্দোলন। প্রথম স্তরে মুসলিম সমাজে যে আলোড়ন-এর সৃষ্টি হয় তাতে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলোর বিশেষ প্রভাব ছিল। এই উপাদানগুলো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকায় আন্দোলন এক মিশ্রিত রূপ ধারণ করে। বিশিষ্ট মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদদের নেতৃত্বেই ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালিত হয়। তাঁরাই মুসলমানদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।[৫৫] ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। তার ফলে মুসলিম সমাজে ইসলামীকরণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফরাজি-ওয়াহাবি তত্ত্বে জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে। ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনে (১৮১৮—১৮৭০) এবং ১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকায় ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবি আন্দোলন দমিত হলেও, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তই তার প্রচণ্ডতা লক্ষ করা যায়, আর তা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। ওয়াহাবিরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।[৫৬] ১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহেও ওয়াহাবিরা বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আত্মত্যাগ করেন। বহু ওয়াহাবি নিহত হন অথবা আন্দামানে নির্বাসিত হন।[৫৭] বলা বাহুল্য মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য অংশের জনসাধারণও এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। প্রথম দিকে এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মুসলিম সমাজে জাগরণ ঘটে। আর তাতে ধর্মতত্ত্ববিদদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের অধীন ভারতবর্ষ ছিল 'দারুল হরব', তাকে তাঁরা 'দারুল ইসলাম'-এ পরিণত করতে চেষ্টা করেন।[৫৮] কিন্তু তাঁদের পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের পথটির বিরোধিতা করেন শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্য এক অংশ। ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে, ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে যে নতুন এক শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাঁরা ব্রিটিশের সহযোগিতায় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান আয়ত্ত করে সমাজের উন্নতিসাধনে ব্রতী হন। তাঁরা সচেতনভাবে ব্রিটিশবিরোধিতার পথ পরিহার করেন। পূর্বাঞ্চলে তাঁদের সহায়ক হন কেরামত আলি নামে এক বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ।[৫৯] ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আবদুল লতিফ ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরেই এই প্রয়াস ব্যাপ্তিলাভ করে। কোন্ পথে পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হয়। বাঙলায় আবদুল লতিফ এবং উত্তরপ্রদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করেন। অন্যদিকে মৌলানা মুহম্মদ কাসিম নানৌতভীর পরিচালনায় উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে ইসলাম চর্চার যে কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানকার উদ্যোগী ব্যক্তিরা ধর্মীয় শিক্ষার সাহায্যে সমাজের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন। এই উভয় গ্রুপই ফরাজি-ওয়াহাবিদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতায় তাঁদের নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন। মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণের জন্য তিনটি কেন্দ্র দ্বিতীয় স্তরের প্রথম দিকে সক্রিয় ছিল: কলিকাতা (১৮৬৩), আলিগড় (১৮৬৪) এবং দেওবন্দ (১৮৬৭)। এই সময়ে আবদুল লতিফের, স্যার সৈয়দ আহমদের ও মৌলানা কাসিম নানৌতভীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের দুটো ধারার ইতিহাস স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।[৬০]

উল্লেখ্য এই, যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন, তাঁরা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করেই তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। সম্পূর্ণভাবে ইসলামধর্মনির্ভর থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা ছিল তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করেন। পশ্চিমের উদারনৈতিক-মানবিক-গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ যাতে ইসলামীয় সামাজিক কাঠামোর কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সে বিষয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তথা ধর্মতত্ত্ববিদরা খুবই সচেতন ছিলেন। সুতরাং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই ইসলামীকরণের ও আধুনিকীকরণের প্রয়াস চলে। স্বভাবতই ফরাজি-ওয়াহাবি-প্রবর্তিত ইসলামীকরণের ধারাটি শুধু অব্যাহত থাকে নি, পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলিম সমাজকে সংহতরূপ দান করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্যে আধুনিকীকরণের সূচনা এবং ইসলামীকরণ ইত্যাদির সংমিশ্রণেই মুসলিম মানস গঠিত হয়।[৬১] প্রায় একই সময়ে প্যান-ইসলামীয় মতবাদের প্রভাব মুসলিম মানসে পড়ে। মুসলিম জগতের সঙ্গে সংযোগ-এর মধ্য দিয়ে মুসলিম মননের আরও ব্যাপ্তি ঘটে। এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলিম মননের সচেতনতা আত্মশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়, ভারতে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করে। একই সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যান-ইসলামীয় মতবাদ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবও জাগ্রত করে। 'উগ্রস্বধর্মপ্রীতি'র সঙ্গে এক 'স্বাধীন' ও 'অখণ্ড' ভারতের রাজনৈতিক চিত্রও মুসলিম মননে পাওয়া যায়।[৬২]

সুতরাং এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম মানস গঠিত হয়। মুসলিম জাগরণের উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়: (ক) ব্রিটিশবিরোধী ধারা; (খ) ইসলামীকরণের ধারা; (গ) ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার

ধারা; (ঘ) আধুনিকীকরণের ধারা; (ঙ) প্যান-ইসলামীয় ধারা। এই উপাদানগুলোকে আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী যেমন মনে হবে, তেমনি প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদানের মধ্যেও অনেক বিরোধী উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভারতীয় মুসলমানদের মতো একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যেভাবে জাগরণ ঘটেছে তাকে সমসাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃবৃন্দ এই জাগরণকে একটি সুসঙ্গত ও সুস্থিত পথে পরিচালনা করতে না পারায় এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী অনেক উপাদান ছিল, তা ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক উপাদানগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি বিপরীতধর্মী উপাদানের মিশ্রিত জটিল আবর্ত মুসলিম মননকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করে মুসলিম জাগরণ ঘটায় মুসলিম মননশীলতা এক ব্যাপক পরিধি নিয়ে ব্যাপ্ত হতে পারে নি। বুদ্ধিজীবীদের এবং নেতৃবৃন্দের দানে আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হলেও তা শিক্ষিত মুসলমানের মনকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বিশেষ প্রসারিত করতে পারে নি। এমনকি, ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয় সে বিষয়েও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোনো যথার্থ মূল্যায়ন মুসলমান বুদ্ধিজীবীর রচনায় এবং নেতৃবৃন্দের ভূমিকায় পাওয়া যায় না। ভারতের মতো দেশে বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে যে নতুন মানবসমাজ গঠনের প্রচেষ্টা কোনো-কোনো সাধকের মধ্যে দেখা যায়, তাকেও প্রজ্বলিত করার কোনো প্রয়াস মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ও ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনায় লক্ষ করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভাবশালী মুসলমানদের একটি অংশকে কংগ্রেসের বৃত্তের বাইরে রাখতে সক্ষম হন; কেন প্যান-ইসলামীয় মতবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষ ঘটায়; আর কেনই বা মুসলিম সমাজের 'উদার মানবিকতা ও শ্রেয়োবোধের' ধারাটি ক্ষীণকায়া তটিনীর মতো প্রবহমান থাকে।[৬৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মুসলিম লীগের পক্ষে পরিবেশ কেন অনুকূল হয়, এবং লীগ নেতৃবৃন্দ কেন মুসলমানদের বৃহত্তর অংশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হল, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দিষ্ট করা যায়: (ক) ইসলামী-করণের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করার প্রয়াস; (খ) জন-সংখ্যার পরিবর্তন; (গ) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 'হিন্দু প্রকৃতি'; (ঘ) হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অসমান অগ্রগতি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষিত মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্জুমান বা সম্মেলন গড়ে তোলেন। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের বক্তব্য তুলে ধরা এবং মুসলিম সমাজ সংহত করাই ছিল আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করেই তাঁরা বলতে শুরু করেন, 'মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র'। মৌলবী আর মওলানারা এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে মুসলমানীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করেন। তাঁরা অ-ইসলামীয় আচার-আচরণ দূর করে ইসলামীয় আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠিত করেন; পীরের আনুগত্যের চেয়ে পয়গম্বরের আনুগত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। মওলানাদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের যোগসূত্র ছিল। আঞ্জুমানগুলোর মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে মওলানাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটল। তার ফলে ইসলামীকরণ সহজেই সম্পন্ন হল। মুসলিম সমাজ খুবই সংহত হল।[৬৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই মওলানা আর উলেমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে তাঁদের অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত তাঁরা উপলব্ধি করেন, উলেমাদের সহায়তায় তাঁরা শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম। ইসলাম ধর্মের নীতি অনুযায়ী আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই উলেমাদের ভূমিকা রয়েছে। তাই উলেমাদেরও রাজ-নীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশের কোনো বাধা ছিল না। মুসলিম রাজনীতিবিদদের সঙ্গে উলেমাদের সংযোগের ফলে মুসলিম সমাজের সংহতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে উলেমাদের মাধ্যমেই জনসংযোগের পথটি প্রশস্ত হয়।[৬৫]

জনসংখ্যার পরিবর্তনের প্রভাবও মুসলিম সমাজে লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই হিন্দু ও মুসলিম লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি স্বাতন্ত্র্য-বোধকে প্রকট করে তোলে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানেরা আত্মসচেতন হন, এবং এক গভীর আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যে অনেক বেশি সচেতন হন তার মূলে ছিল কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতনতা।[৬৬]

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা ও কংগ্রেস নেতারা মুসলিম মনন সম্বন্ধে সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। একসময়ে বিদেশ থেকে আগত হলেও মুসলমানরা এদেশেরই বাসিন্দা, ইসলাম এদেশেরই একটি বিশিষ্ট ধর্ম—এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসকদের আমলে মুসলিম সমাজের সমস্যা-গুলোও অনুধাবন করা উচিত ছিল। প্রথম স্তরের পরে বিপ্লবীরা 'হিন্দু মানসিকতা' অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলেও মুসলিম মননে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। শিক্ষিত মুসলমানদের প্রভাবশালী অংশ বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের 'সেকুলার' দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটি অংশের ওপর হিন্দু মানসিকতার প্রভাব বিভিন্ন স্তরে ছিল। জাতীয়তাবাদের 'হিন্দু রঙ' থাকায় মুসলমানদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও কংগ্রেস সংগঠনের সীমাবদ্ধতার পূর্ণ সুযোগ মুসলিম লীগ গ্রহণ করে।[৬৭]

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমান অগ্রগতি ঘটে। তুলনায় হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজ অনেকটা পিছিয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করায় এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করায় হিন্দু সমাজের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। পরের দিকে যখন হিন্দু সমাজের শিক্ষিত একটি অংশের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে মোহ কেটে যায় এবং হিন্দু যুবকরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তখনই মুসলিম সমাজে ব্রিটিশের সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতির প্রয়াস চলে। এইভাবে দুটো বিপরীতমুখী স্রোতোধারার সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতোধারায় 'হিন্দু মানসিকতা' দূর করে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই প্রধান স্রোতোধারার একটি শাখা হল (ক) সশস্ত্র সংগ্রাম, আর একটি হল (খ) মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রাম। মুসলিম রাজ-নীতির প্রধান স্রোতোধারার মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল: (ক) সম্প্রদায়গতস্বার্থনির্ভর মুসলিম লীগ-পরিচালিত আন্দোলন; (খ) মহাত্মা গান্ধী-প্রভাবিত ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; (গ) মুসলিম জাতীয়তাবাদী-পরিচালিত ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রথম স্রোতোধারায় হিন্দু মানসিকতার প্রভাব, আর দ্বিতীয় স্রোতোধারায় ছিল মুসলিম মানসিকতার প্রভাব। এখানে উল্লেখিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মুসলিম সমাজেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রবল ছিল। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদকে মুখ্য বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। তাঁদের মধ্যে একটি অংশ ছিল কংগ্রেস-প্রভাবিত, আর-একটি অংশ ছিল সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। উভয় গ্রুপের ওপর ইসলামের প্রভাব

থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মুসলিম লীগ থেকে স্বতন্ত্র পথে চলেন।[৬৮] ইসলাম চর্চার কেন্দ্র দেওবন্দে একটি গোপন বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খিলাফতপন্থীদের মধ্য থেকেও অনেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণ করেন। বিদেশে 'হিন্দু' বিপ্লবীদের সঙ্গে 'মুসলিম' বিপ্লবীরা একসঙ্গেই চলেন; ধর্ম কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে যে বৈপ্লবিক কেন্দ্র গঠিত হয় সেখানে মহেন্দ্র প্রতাপ, মহম্মদ বরকতুল্লাহ এবং আরও অনেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করেন তাকে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা চলে।[৬৯] পরে তাঁদের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফতপন্থী বিপ্লবীদের একটি অংশ তাসকন্দ যান। তাঁরা বলশেভিকদের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হন। তাঁরা বলশেভিক মতবাদের সঙ্গে ঐস্লামিক প্রজাতন্ত্রের মিল খুঁজে পান এবং সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রচার করেন।[৭০] কিন্তু মুসলমান বিপ্লবীরা ভারতীয় মুসলিম সমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেন নি। কারণ, মুসলিম লীগ-উলেমা জোট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে মুখ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে শ্রেণী বা সামাজিক সংগ্রামগুলোকে সামঞ্জস্য সাধন করে মুক্তিসংগ্রামকে দুর্বার না করে সম্প্রদায়গত বৃত্তে আবদ্ধ থেকে 'হিন্দু কংগ্রেসকে' প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উল্লেখ করে মুসলিম সমাজকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালনা করেন।[৭১] ভারতের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ মুসলিম লীগের অনুকূলেই ছিল। মুসলিম লীগের প্রচেষ্টায় সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ বৃত্তটি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়। তার ফলে জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও মুসলিম বিপ্লবীদের প্রভাব হ্রাস পায়। কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমান শিল্পপতি, জমিদার ও জোতদারের নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ মুসলমান জনসাধারণের পার্টিতে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুসলিম লীগের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়; পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের তত্ত্ব মুসলিম মননকে প্রভাবিত করে। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী অংশ এই তত্ত্বের প্রচার করেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানেরা আলাদা জাত, 'মুসলিম সংস্কৃতি' 'হিন্দু সংস্কৃতি' থেকে পৃথক। এইভাবে সংস্কৃতির আবরণে দ্বিজাতিতত্ত্ব আরও জোরালোভাবে প্রচার করা হয়। স্বভাবতই সম্প্রদায়গত বৃত্তটি আরও সুদৃঢ় হয়।[৭২]

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যদি জাতীয়তাবাদী, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও মার্কসবাদী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদের ওপর আঘাত হানার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারত তাহলে হয়তো ইতিহাসের গতিধারা ভিন্ন হত। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এবং দেশ-ভাগের ফলে যে বিপুলপরিমাণ রক্তক্ষরণ ঘটেছে ও অপরিসীম দুঃখবেদনা সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের জীবনে নেমে এসেছে, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, তার চেয়েও অনেক অনেক কম রক্তক্ষরণে ও দুঃখবেদনায় এক ঐক্যবদ্ধ সুস্থ সবল জাতির আবির্ভাব ঘটত। ১৯৪৫—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয় তাতে 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' সম্প্রদায়গত দুটো বৃত্তই অনেকটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ভারতে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে শেষ পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৭৩] 'সেকুলার' কংগ্রেস এবং 'মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী' লীগ চায় নি এই গণ-আন্দোলন তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করুক। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা দুটো সংগঠনের নেতাদের শ্রেণীগত অবস্থানকেই স্পষ্ট করে তোলে। নিঃসন্দেহে কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মোচন করে ভারতে 'সেকুলার' ভিতকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু কংগ্রেস এই জাতীয়তাবাদী ধারাটিকে সমাজতন্ত্রমুখীন করতে প্রয়াসী হয় নি বলে

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। ১৯৪৫—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গণ-আন্দোলনের অগ্রগতি প্রতিহত হওয়ায় জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাতে সম্প্রদায়গত দুটো বৃত্তই পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়; দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায়।[৭৪]

সূত্র-নির্দেশ

১. R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, vol. I, Calcutta 1962, pp. 48-285; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৯।

২. R. C. Majumdar, op. cit, vol. I and vol. II, Calcutta 1963; Amalendu De, Raja Subodh Chandra Mallik and His Times, in Bengal Past And Present, July-December, 1979 (Henceforth abbreviated as Bengal Past, 1979). ১৭২ পৃষ্ঠার দীর্ঘ রচনায় আমি আন্দোলনের বিভিন্নধারা আলোচনা করেছি।

৩. R. C. Majumdar, op. cit, vol. I, pp. 476-478; M. Mujeeb, The Indian Muslims, London, 1967, pp. 432-433; অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৪

৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, কলিকাতা, ১৯৬১; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলিকাতা, ১৯৬৯; Judith M. Brown, Gandhi's Rise to Power Indian Politics, 1915-1922, Cambridge, 1972; M. A. Persits, Revolutionaries of India in Soviet Russia, Moscow, 1983

৫. Amalendu De, Aurobindo Ghose in Indian Politics (1893-1910): An Assessment of the Role of a Noted Bengali Intellectual, in The Quarterly Review of Historical Studies, no. 2, Calcutta 1985-86 (Henceforth abbreviated as Aurobindo Ghose); অমলেন্দু দে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৮৭৬-১৯৪৭), চতুরঙ্গ, মার্চ : ১৯৮৬ (Henceforth abbreviated as চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৮৬)

৬. ক্রপদী মার্কসিস্ট সাহিত্যে (Classical Marxist Literature) এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে। এখানে খুবই সংক্ষেপে দ্বন্দ্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হল। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ঔপনিবেশিক প্রশ্নের জন্য দ্রষ্টব্য Bengal Past, 1979, p. 139.

৭. Marx, K and Engels, F., Ireland and the Irish Question, Moscow, 1971; Yelena Stepanova Frederick Engels, Moscow, 1958, p. 157. মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন: '...national emancipation of Ireland is not a question of abstract justice or humanitarian sentiment, but the first condition of their own social emancipation' (Ibid) তাঁরা দুজনেই বলেন, যদি আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন হয় এবং সেখানে একটি বিপ্লব ঘটে, তাহলে ইংরেজ শাসকশ্রেণী মস্তবড় আঘাত পাবে এবং ইংলণ্ডে বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। ইংলণ্ডের বিপ্লব ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

৮. Marx and Engels, Ireland and the Irish Question

৯. Ibid

১০. Ibid

১১. Yelena Stepanova, op. cit., p. 143. এঙ্গেলস পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে যে শিরোনামায় প্রবন্ধগুলো লেখেন তা হল What Does Poland Mean to The Working Class.

১২. V. I. Lenin, The National Liberation Movement in the East, Moscow, 1957.

১৩. V. I. Lenin, Marx-Engels-Marxism, Moscow, 1953, p. 357. লেনিন লেখেন: 'The policy of Marx and Engels in the Irish

question serves as a splendid example, which retains immense practical importance to the present time, of the attitude the proletariat of the oppressing nations should adopt toward national movements' (Ibid).

১৪. Mao Tse-tung, Selected Works, vol. 3, Bombay, 1954, pp. 81-82. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাও জেদং লেখেন : "The contradiction between imperialism and the Chinese nation, and the contradiction between feudalism and the great masses of the people, are the principal contradictions in modern Chinese society. Of course there are other contradictions, such as the contradictions between the bourgeoisie and the proletariat and the contradictions within the reactionary ruling classes themselves. The contradiction between imperialism and the Chinese nation, however, is the principal one among the various contradictions (Ibid).

১৫. Mao Tse-tung, Selected Works, vol. 2, Bombay, 1954, p. 264. মাও লেখেন : 'To support a long-term war with a long-term co-operation, or in other words, to subordinate the class struggle to the present national struggle to resist Japan—that is the fundamental principle of the united front' (Ibid).

১৬. Ibid, p. 250. মাও লেখেন : 'It is a settled principle that in the Anti-Japanese War everything must be subordinated to the interests of resistance to Japan...But the classes and class struggle do exist, and when some people deny this fact, deny the existence of the class struggle, they are wrong...In order to unite against Japan we should carry out a suitable policy that can adjust the class relations ; on the one hand we should not leave the toiling masses without any protection or guarantee politically and materially, and on the other hand we should also take into consideration the interests of the rich, in order to meet the demand of unity against the enemy. To attend exclusively to one thing and forget the other will be deterimental to the War of Resistance' (Ibid).

১৭. Ibid, p. 264. মাও লেখেন : 'In a nation which is struggling against a foreign foe, the class struggle assumes the form of national struggle, a form indicating the consistence of the two. On the one hand, the economic and political demands of the classes during the historical period of national struggle should be based on the condition of not disrupting the cooperation of these classes ; on the other, all the demands of the class struggle should start from the requirements of the national struggle (from the cause of resistance to Japan). Thus unity and independence within the united front, the national struggle and the class struggle, become consistent' (Ibid).

১৮. চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৮৬। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অমলেন্দু দে, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা, অনুশীলনবার্তা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

১৯. Aurobindo Ghose ; চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৮৬। আমি এই দুটো রচনায় অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছি। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য আমার সম্পাদিত পুলিনবিহারী দাস, আমার জীবনকাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৭

২০. M. A. Persits, op. cit., pp. 48-50. ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে মহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৫৮-১৯২৭) ইজভেস্তিয়া (Izvestia) কাগজের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেন : "I am not a Communist, nor a socialist...but my political programme so far is to drive the English out of Asia. I am an uncompromising enemy of European capitalism in Asia, as represented by the English, above all. In this sense, I come close to Communists, and in this respect, we are your natural allies." (Ibid, pp. 48-49). বরকতুল্লাহ ভূপালে জন্মগ্রহণ করেন। কারও মতে সম্ভবত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বরকতুল্লাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য James Campbell Ker, Political Trouble in India 1907-1917, Calcutta, 1973.

২১. M.A. Persits, op. cit., p. 21 ; অনুশীলনবার্তা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি রাসবিহারী বসু যে সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন তা ব্যর্থ হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈনিকরা বিদ্রোহ করে এবং এক সপ্তাহের জন্য সিঙ্গাপুর ভারতীয় সৈন্যদের দখলে থাকে। রুশ, জাপান ও ব্রিটিশ রণতরী যুক্তভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। বর্মায় প্যান-ইসলামিক মুসলমানরা বিপ্লবের আয়োজন করেন, আর ছিল আমেরিকার 'গদর' দল। 'গদর' পত্রিকা বর্মায় মুসলমান বিপ্লবীদের খুব প্রভাবিত করে। বোম্বাইতে বেলুচি পলটনের জনৈক সৈনিক তাঁদের এক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করায় বেলুচ সেনাদলকে রেঙ্গুনে আটকে রাখা হয়। রেঙ্গুনের মুসলমান বিপ্লবীরা 'গদর' পত্রিকার সাহায্যে বেলুচ সেনাদলে বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই বেলুচ সেনাদল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করে। কিন্তু সরকার পূর্বেই খবর পেয়ে যায় এবং কঠোরভাবে এই সেনাদলকে শাস্তি দেয়। দুইশত বেলুচ সৈন্যকে বন্দী করে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। তারপরেই ঘটে সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্মার মুসলমান বিপ্লবীরা পুনরায় বিদ্রোহের আয়োজন করেন। এবারও ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্মার সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিষয়ে তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বন্দী-জীবন (২য় খণ্ড), কলিকাতা, পৃষ্ঠা : ১১২-১২৬ ; Sho Kuwajima, Singapore Mutiny 1915, Osaka, 1984 ; চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৬

২২. শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বন্দী-জীবন (২য় খণ্ড), কলিকাতা; M. A. Persits, op. cit. pp. 19-21.

২৩. চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৬ ; Aurobindo Ghose.

২৪. Bengal Past, 1979, pp. 134-137.

২৫. James Campbell Ker, op, cit., pp. 120-122 ; M. A. Persits, op, cit. ; পুলিনবিহারী দাস, আমার জীবন কাহিনী ; চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৬

২৬. অনুশীলনবার্তা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; Aurobindo Ghose ; চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৬ ; বিস্তৃত আলোচনার জন্য রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু লিখিত রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

২৭. অমলেন্দু দে, চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৯৭-২০৩

২৮. R. C. Majumdar, op, cit., vols. I & II ; Bengal Past, 1979, pp. 40-42, 61

২৯. R. C. Majumdar, op, cit., vol. III, Calcutta, 1963, pp. 325-326. ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩০. R. C. Majumdar, op. cit., vols. II & III মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

৩১. Judith M. Brown, op. cit., pp. 52-122. চম্পারণ, কয়রা ও আমেদাবাদ, এই তিনটি অঞ্চলের আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চম্পারণে গান্ধীজীর আন্দোলন বিহার সরকারের বিরোধিতায় সফল হয়নি, যদিও এই আন্দোলনের ফলে ওই অঞ্চলের বহুসংখ্যক মানুষ সংঘবদ্ধ হল এবং গান্ধীজীর সুখ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

কয়রার সত্যাগ্রহ আন্দোলনও সফল হয়নি। তা সত্ত্বেও গান্ধীজীর প্রভাব বৃদ্ধি পেল। অবশ্য আমেদাবাদের সত্যাগ্রহের ফলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পায়।

৩২. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা : ৩১৫

৩৩. Bipan Chandra, Nationalist Historians' Interpretations of the Indian National Movement, in Sabyasachi Bhattacharya and Romila Thapar, Situating Indian History for Sarvepalli Gopal, OUP, 1986. p. 232

৩৪. W. Hauser, Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929-42 ; A Study of the Indian Peasant Movement, Chicago, 1961, pp. 51-52 ; অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা : ৩১৬, ৩১৭ ; Shive Kumar, Peasantry and the Indian National Movement, 1919-1939, Meerut, 1979-1980, pp. 179-180.

৩৬. Bipan Chandra, op. cit., p. 232.

৩৭. Ibid, p. 233

৩৮. Ibid.

৩৯. Ibid.

৪০. Ibid.

৪১. Files of Amrita Bazar Patrika, July-August, 1938.

৪২. Ibid, 22 August, 1938 ; W. Hauser, op. cit., p. 20 ; M. A. Rasul, A History of the All India Kisan Sabha, Calcutta, 1974, pp. 18, 29. ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে কিষাণ সভার প্রভাব নষ্ট করার জন্য বিহার কংগ্রেসের কয়েকজন হরিজন-সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদের পরিচালনায় 'বিহার প্রাদেশিক ক্ষেত মজুর সঙ্ঘ' নামক একটি নতুন সংস্থা গঠন করেন। এই ক্ষেতমজুর সঙ্ঘে জগজীবন রাম বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে স্বামী সহজানন্দের মতপার্থক্য এত তীব্র হয় যে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সহজানন্দ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভা থেকে পদত্যাগ করেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসের পরে তিনি সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বিহারে কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ছিলেন ছোটো-ছোটো ভূস্বামীরা। বিহারে বাকাশত, আন্দোলন এইসব ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। স্বভাবতই কংগ্রেস সরকার এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ১৩৩৮-১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সহজানন্দ পরিচালিত কৃষক আন্দোলন বিহারে ব্যাপকতা লাভ করে এইজন্য যে, তিনি সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি কংগ্রেস নেতা হয়েও 'জাতীয়তাবাদের কাঠামোর মধ্যেই সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। তাই তাঁকে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। (দ্র Files of Amrit Bazar Patrika, December, 1937 and January, 1938 ; W. Hauser, op. cit., p. 156 ; Stephen Henningham, Peasant Movement in Colonial India North Bihar 1917-1942, Canbera, 1982, p. 163 ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষকসভার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা : ৬৭-৬৮)

৪৩. R. Palme Dutt, India To-Day, Bombay, 1947, pp. 470-475 ; R. C. Majumdar, op. cit., vol. III

৪৪. M. A. Persits, op. cit., p. 117

৪৫. Ibid, p. 119, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন শওকত উসমানী এম. এন. রায়ের কাছে যে পত্র লেখেন তাতে এই মন্তব্য করেন।

৪৬. Ibid ; মুজফ্ফর আহ্‌মদ, প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ; বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Sir Cecil Kaye, Communism in India (Compiled and Edited by Subodh Roy), Calcutta, 1971.

৪৭. Sir Cecil Kaye, op. cit ; Sir Horace Williamson, India and Communism, Calcutta, 1976 ; Sir David Petrie, Communism in India, Calcutta, 1972 ; G. Adhikary (Edited), Documents of the History of the Communist Party of India, vols. I-III

৪৮. G. Adhikary (Edited), op. cit., vol. I, pp. 281, 340-354. মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী স্বাক্ষরিত ম্যানিফেস্টো দ্রষ্টব্য। মৌলানা হসরৎ মোহানী ছিলেন খিলাফতপন্থী নেতা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। তিনি নিজেকে 'ঐশ্লামিক সমাজতন্ত্রী' বলে উল্লেখ করতেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জীর আবেদন থেকেই হসরৎ মোহানী 'পূর্ণ স্বাধীনতার' ধারণা পান। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মৌলানা হসরৎ মোহানী কানপুরে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন (Ibid).

৫০. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা : ৩৫৯

৫১. ঐ পৃষ্ঠা : ৩৫৯-৩৬০

৫২. অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৫

৫৩. ঐ

৫৪. ঐ ; বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

৫৫. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা : ৬০-১৪২

৫৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩১, ১৪২

৫৭. ঐ

৫৮. ঐ

৫৯. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৬৫-১৬৬

৬০. অমলেন্দু দে, সমাজ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা : ১৫-১১

৬১. ঐ, পৃষ্ঠা : ১০-১৬

৬২. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪-১৭

৬৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৫-১৮

৬৪. আমার রচিত 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও আজিজুল হক', 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' ও 'Islam in Modern India' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছি।

৬৫. ঐ

৬৬. ঐ

৬৭. ঐ

৬৮. Abdul Ghaffar Khan, My Life And Struggle ; Autobiography of Badshah Khan, Delhi, 1969 ; M. A. Persits, op. cit.

৬৯. M. A. Persits, op. cit., pp. 21-22

৭০. Ibid, p. 47. বরকতুল্লাহ 'Bolshevik Ideas and the Islamic Republic' নামক প্রবন্ধে লেখেন : Both Marxism and all religions had been 'handed down by the Lord in order to save the poor and the needy, reassure all men and bring peoples into kinship with each other' (Ibid).

৭১. এই বিষয়ে উপরে উল্লেখিত আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য

৭২. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা : ৩১০-৩১১, ৩৫৫

৭৩. চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৮৬

৭৪. শেষ পর্যায়ে (১৯৪৫-১৯৪৬) কংগ্রেস ও লীগের কার্যাবলীতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নৌবিদ্রোহের সময়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের ভূমিকা উল্লেখ্য।

মধ্যরাত্রির জীবনী

রবিশংকর বল

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলেন নীহারিকা। বিতান দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে বিহারি রিকশাওলার মাথায় হোলড-অল, ব্যাগ ইত্যাদি। তিন বছর পরে বিতান আবার এল। অথচ এই ক বছরের ব্যবধানে তাকে বড়ো বয়স্ক মনে হচ্ছে, যেন বিতান তিন হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে। রিকশাওলা জিনিসপত্রগুলো দরজার মুখেই নাবিয়ে দিয়ে চলে যায়। বিতান আচমকা হেসে ফেলে।

একেবারে চলে এলাম, মা—

চাকরিটা ছেড়ে দিলি?

বাজপড়া বাড়ির মতো কিরকম ফুটিফাটা চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল বিতান। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুম হয় নি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাকসিতে গা এলিয়েই ঘুম পেয়েছিল তার, বড়ো নির্ভরতার ঘুম। আঃ, প্রিয় শহরটায় চিরকালের মতোই তবে চলে এল সে আবার। সাদার্ন অ্যাভেনিউর ঘাসঢাকা বুলেভারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থেকে, শীতকালে তো বেশি রাতে হিম জড়িয়ে যেত প্রতি রোমকূপে, প্রায় আকাশটাকে বুকে ধারণ করার অনুভবে শুয়ে থেকে, শহরের প্রতিটি চিৎকার আর কোলাহল, বাসের চাকার ঘষটানি, ট্যাকসির হরন, সব—সবই তো কেমন কল্লোলমুখর সিন্ধুশব্দের মতো মনে হত তার।

তুই যে কুটুমের মতো দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলি—

কেমন? ইষ্টিকুটুম পাখির মতো? জিনিসপত্রগুলি ঘরের ভিতরে ঢোকাতে ঢোকাতে নীহারিকাকে দেখছিল বিতান। তোমরা দেশ-গাঁয়ে ইষ্টিকুটুম পাখি দেখেছ না মা? আদ্ধেক শরীরটা বিছানাতেই মেলে দেয় সে। পা দুখানি শূন্যে ঝোলে বিতানের।

ধরো না কেন, আমি আবার তোমার সেই ইষ্টি-কুটুম পাখি হলাম—

এ আবার কেমনধারা কথা?

সেরকমই তো। নইলে তুমি ভেবেছিলে, আমি এমনভাবে চলে আসব? কথা বলতে-বলতেই বিতানের

চোখ বুজে আসে। আসলে নীহারিকার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। এমন অতিথির মতো কেন মনে হল আজ মার মুখোমুখি? ভ্রূণ, আমরা, রক্তের নানা গল্পের ছায়ায় তার চোখ বুজে গেছে—যেন বিপরীত এক রক্তস্রোতে ভেসে-ভেসে এল সে—নীহারিকার কাছে, যে বিতান যেন যীশু, কুমারী মায়ের দিকে তাকিয়ে নীরব প্রলাপে মুখর—তাহলে রক্তেও কোনো নির্ভরতা নেই। বিতান চোখ মেলে দেখল, নীহারিকা তার দিকে অভিনিবেশে তাকিয়ে আছেন।

কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল? নীহারিকা বিছানার ধারে বিতানের পাশে এসে বসলেন। জামার বোতাম খোলা, হা-হা বুকে পাঁজরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, এত-টাই রোগা হয়ে গেছে বিতান। রুগ্ন অবশ্য সে ছোটো-বেলা থেকেই। সে জন্মাবার বছরখানেক পর থেকেই দু-দুবার বাঁচবার কোনো আশা ছিল না, টাইফয়েডের ওপর টাইফয়েড, তখন নীহারিকা সারা রাত জেগে বসে থাকতেন ছেলের পাশে। মালিকের সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

না তো—। মা একটু চা খাওয়াবে? বিতান কনুইয়ের ওপর ভর রেখে, হাতের তালুতে মাথা রাখল। মাকে আমি অনেকদিন এভাবে কাছ থেকে দেখি নি, সে ভাবল। ছেলেবেলায় কখনো মাকে কাছে না পেলে সে মায়ের কাপড়ে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকত। তখন হয়তো স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। শহরের অভ্যন্তরে গ্রীষ্মের দুপুরে সে মাতাল হয়ে যেত মায়ের কাপড়ের গন্ধে। দেশ-গাঁ সে দেখে নি, না ঘাস না জল, কিন্তু এমন গন্ধের তটরেখা সে ছুঁয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই গন্ধই ছিল তার কাছে মায়ের স্বাদ, আজও, যেহেতু বড়ো হয়ে মার সঙ্গে তার জড়িয়ে ছড়িয়ে কথা হয় নি কোনোদিন, আজ অব্দি, আর এই গন্ধেও সে ডুবে যেতে পারে নি বহু বছর। শুধু একটা বিশেষ গন্ধের স্মৃতি, যা তার মা, তার নীহারিকা মা।

বিতান দেখল, নীহারিকা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। এই তিন বছরে অনেক কিছুই নিশ্চয় বদলে গেছে, যেমন এই ঘরটি, আগের চেয়ে অনেক বেশি সাজানো গোছানো, বাড়তি জিনিসও হয়েছে, যেমন সোফা, টি ভি ইত্যাদি। তার বাড়ির লোক, পরিচিত জনেরা জানত, এই চাকরিটায় বিতান ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না বা ঠিক চাকরিও নয়, আসলে দূরত্ব, এই শহর থেকে অনেক দূরে উত্তরভারতের নিষ্প্রাণ শহরটিতে—বিতানের প্রথম দিককার চিঠিগুলোতে এরকমটাই থাকত। তবু তিন বছর পরে, যে সময়-সীমায় অস্তিত্বের নানা ক্ষত সাফসুরত হয়ে যায় বা হওয়াই সম্ভব, ঠিক তখনই, বিতান হুট করে চাকরিটা ছেড়ে চলে আসবে, এমনটা তো অস্বাভাবিক মনে হতেই পারে। বিতানও তা জানে। চাকরিটা কেন সে ছেড়ে দিল, সেই কারণটাও তো তার কাছে স্বচ্ছ নয়, অর্থাৎ কারুর কাছে গুছিয়ে বলবার মতো যুক্তি-পরম্পরাও তার ভাঁড়ারে নেই। তবু চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তার নিজেকে বেশ বিজেতার মতো মনে হয়েছিল, যেন টিলায় উঠে সূর্যোদয় দেখার মতো, যেহেতু আটাশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। এর আগে দুবার বিভিন্ন কারণে তাকে কোমপানি থেকে শো-কজ করা হয়েছিল। দুটি চিঠিরই বয়ানের একটি অভিন্নতা তার মনে আছে, য়্যু হ্যাভ ডেভ্‌লপ্‌ড্‌ আ মোড অব ইররেসপনসিবিলিটি···।

তুই কিছু খাবি না? আগে খেয়ে নে কিছু। রান্নাঘর থেকে নীহারিকার কথা ভেসে এল। সেই সঙ্গে স্টোভ ধরানোর শব্দ, জলের শব্দ, সেলফ থেকে কাপ নাবানো আর নীহারিকার পায়ের শব্দ, হালকা, ভূতের মতো। বিতান উঠে বসতে-বসতেই দেখল, নীহারিকা ভেতর দিকের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নীহারিকা চেয়ে থাকলেন বিতানের দিকে। তিন হাজার বছরের কত আঁকিবুকি মুখে নিয়ে বসে আছে তার ছেলে। বিতানের দিকে তাকালেই তাঁর মনে পড়ে নিজের বাবার কথা। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

কয়েক বছর পরেই—ভারত-পাকিস্তান হয়ে যাওয়া —দূরে কাছে যখনই কেবল গ্রামপতনের শব্দ—মূল্যবোধ আর নৈতিকতা যখন বুকটাকে ,দুফালি করে ভেঙেচুরে যাচ্ছে—তার বাবা তখন সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের মতো মানস-সরোবরের স্বপ্নে ডানা ঝাপটাচ্ছেন। রোগা, ছ-ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ তার বাবা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটতেন। কথা বলতেন খুব কম। ধীরে। একদিন বলেছিলেন, রাজনীতি কখনো মানুষের হৃদয়ের জিনিস নয়—

তবু রাজনীতি ছাড়া মানুষ আর কী নিয়ে লড়বে? কেউ প্রশ্ন করেছিল তখন। বাবা এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। সময়ের নানা বিভ্রান্তি এভাবেই তাকে আলাদা করে দিচ্ছিল সকলের থেকে, হয়তো নিজের হৃদয়ের থেকেও। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে তিনি লিখছিলেন আত্মজীবনী, যা অসমাপ্ত, এখন নীহারিকার ট্রাঙ্কে, ন্যাপথলিনের গন্ধের ভিতরে। তার বাবা বলতেন, ও জীবনী আমার নয়—আমার নয়—

তাহলে কার?

মধ্যরাত্রির। বাবা কি শেষকালে পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন? নীহারিকা জানেন না। বিতানও কি তবে মধ্যরাত্রির সন্তান?

এই বাড়িটায় আর থাকতে ইচ্ছে করে না। বিতান শুনল, নীহারিকার গলার ভিতরে প্রাচীন বালি ঝরছে।

কেন?

কতদিন কোথাও যাই নি।

বেড়াতে যাবে?

না। মানুষ তো নতুন-নতুন বাড়ি বদলায়—

ভালো বাড়ির লোভ হয় বুঝি?

হৃদয়পুরের দিকে একটা জমির সন্ধান পেয়েছি—

বিতান চুপ করে থাকল। মার জিজ্ঞাসার ধরন কি এইরকম? এত স্বপ্নাভাসের মধ্য দিয়ে? চাকরিটা সে এমন আকস্মিকভাবে ছেড়ে দিল—কেন—মা তবু সহজে জিজ্ঞেস করতে পারে না তাকে। সহজ জিজ্ঞাসার রক্তপাতে তারা কেউ—এই মা আর ছেলে, বিতান আর নীহারিকা দীন' হয় নি কখনো, তবু স্বপ্নে তো আমরা এখনো কথা বলি, বিতান ভাবল।

আকাশ দেখছিল বিতান। তার ছেলেবেলার সেই আকাশ আর নেই। ভাড়াবাড়ির একতলার ছাদে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশ দেখতে-দেখতে ভাবছিল বিতান, আকাশ, সমুদ্র সবকিছুই বদলায়। মাতৃত্বের সংজ্ঞা বদলায়। গন্ধের শরীর একসময় শুধু গন্ধের স্মৃতি হয়ে যায়। নীহারিকার কথা ভেবে বিতানের গলার কাছে সূক্ষ্ম ব্যথার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। কী অসহায় তুমি নীহারিকা, যেন কুন্তীর মতো তুমি আজ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে···ভ্রূণের সন্তানের পরিচয় এভাবেই বদলে যায় তবে!

ট্রেন জারনি করে এলি, আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়—

আকাশের আলোয় নীহারিকাকে দেখতে পেল বিতান।

তখন তুমি বাড়ির কথা বলছিলে—

হ্যাঁ, হৃদয়পুরের দিকে একটা জমির খোঁজ পাওয়া গেছে।

কত টাকা?

চার হাজার কাঠা।

তুমি কি বাড়িতে পুকুর বানাবে—বাগান করবে—সুপুরি, নিম, দোপাটি গাছ করবে?

তাতে তো অনেক জায়গা দরকার।

কত? একটা পৃথিবী? এই মহাবিশ্ব—

আবার বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করলি? তোর বাবাও তো করেন।

বিতান চুপ করে গেল। পৌরুষের মুখোশটাকে তার মধ্যেও কি মা আবিষ্কার করতে চায়? যেন সন্তান নয়, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন নীহারিকা।

কী হল? শুতে যাবি না?

তুমি একটা মাদুর নিয়ে এসো—এখনি শোব না—

কেন, ঘুম আসছে না?

না—

অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বি—ক্লান্ত আছিস তো—

ক্লান্ত হয়ে কি জাগতে নেই?

তোর কথাবার্তার রকমসকম বুঝি না বাবা।

কেন বোঝ না?

তোর বাবা বলেন, আমরা পুরোনো যুগের মানুষ।

তোমার বাবা তোমার কথা বুঝতেন না?

তা বুঝবেন না কেন—

তাহলে তুমি বোঝ না কেন? তুমি কত পুরোনো যুগের? তোমার বাবার চেয়েও? তোমার ঠাকুমার চেয়েও?

আমি তো লেখাপড়া শিখি নি।

বিতান কারনিসের উপর ভর রেখে নীচের দিকে তাকাল। নীচের গলি সুনসান। লাইটপোসটের হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে। যেন নক্ষত্রদের মড়াটে ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি। মা আর সন্তান, জ্ঞানের এই আদিতম বীজ, এর বাইরেও আর কোন্ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে পরস্পরকে বুঝে নেবার জন্য? নীহারিকার আর কোন্ জ্ঞান চাই? এই প্রশ্ন তো সে নীহারিকাকে করতে পারবে না। কেননা সেই জ্ঞানের শরীরে দাঁতাল শুয়োরের চিৎকারের জন্ম দিয়েছিল সে নিজেই, তার চেতনা। আড়াই কোটি বছর আগে যে নক্ষত্রটি মারা গিয়েছে—যার আলো ১৯৮৬-র ১৭ই নভেমবর দাঁড়িয়ে সে দেখতে পাচ্ছে—সেই নক্ষত্রের জীবনকালের সঙ্গে সে নিজেকে সংযুক্ত করবে কিভাবে? সে তো নীহারিকার সন্তান—তাই কি এত সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধান? নিজের জন্মফলের খাতাটি ওলটাতে-ওলটাতে সে একদিন দেখেছিল—'এই জাতকের জন্মনক্ষত্র কালপুরুষের মুখে পড়ায় জাতক অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় হইবে'—তাই কি তার চেতনা এমন আগ্রাসী হয়ে সম্পর্কের অন্তঃসারগুলি বকরাক্ষসের মতো গিলতে চায়?

আচ্ছা মা—। বিতান নীহারিকার দিকে ফিরে দাঁড়াল। নতুন বাড়িতে তুমি একটা অ্যাকোরিয়াম রাখবে না?

নীহারিকা বিহ্বলের মতো বিতানের দিকে চেয়ে থাকেন।

কী সব যেন নাম—ব্ল্যাক ফিশ, অ্যানজেল, আর ওই লাল-লাল মাছগুলো—বিতান হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেলে—তোমার মনে আছে মা, তখনও এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক আসে নি, হারিকেনের আলো ছিল, সেবার রথের মেলা থেকে অনেক মাছ কিনে আমি বয়ামে এনে রেখেছিলাম—সেই যে বয়ামটায় তুমি আখের গুড় রাখতে—এইসব মাছেরা তো আলো ছাড়া বাঁচে না—এইসব রঙিন মাছেরা – আর ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য অনেকটা জায়গা ওদের লাগে, সবুজ শ্যাওলা চাই—সে সব তো কিছুই ছিল না—কী যেন ঝাঁঝিগাছ, হ্যাঁ, তাও ছিল না—ভোরবেলা উঠে দেখলাম, জোড়া অ্যানজেল মরে গেছে—সারাদিন আমার কী কান্না—তুমি খাওয়াতে পর্যন্ত পার নি—তারপর কয়েকদিনের মধ্যে সব মাছগুলোই মরে গেল—

বাবা, এতসব তোর মনে আছে? বগবগানিও জানিস—

তুমি জান না, জাতকের জন্মনক্ষত্র কালপুরুষের মুখে পড়ায় জাতক অত্যন্ত বাকপটু হইবে?

আচ্ছা, যদি অ্যাকোরিয়াম করি—নীহারিকা হাসলেন—করাই তো যায়, তাহলে কি তুই সেখানে রঙিন মাছ হয়ে সাঁতার কাটবি?

বিতান মরা মাছের মতো চোখে নীহারিকার দিকে তাকিয়ে থাকল। এই নীহারিকাকে সে কোনোদিন দেখে নি—যেন বিশাল এক নারীমাছের মতো, যে নীহারিকা তার পঞ্চাশ বছরের জীবনের স্রোত ভেঙে তার দিকে এগিয়ে আসছে—তার রঙিন সন্তান মাছের

দিকে। বিতান হাওয়ায় শ্যাওলার গন্ধ পেল। ঝাঁঝিরও।

কিন্তু জল বার করার সময় অমন জাল দিয়ে ধরতে যেও না আমায় তুমি।

তুই কিন্তু আজেবাজে বকছিস তখন থেকে। ঘুমোতে চল—নীহারিকা বিতানের হাত ধরে টানলেন।

আচ্ছা মা, সত্যিই যদি হৃদয়পুরের জমিটা কেনা হয়ে যায়—তোমার মনের মতন একটা বাড়িও সেখানে হতে পারে—তবু এই বাড়িটা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

তা তো হবেই—

তাহলে?

তা বলে কি মানুষ নতুন বাড়িতে যায় না?

যায়। কিন্তু কষ্ট নিয়ে তবু কেন যায়?

নিজের ঘর তো চায় মানুষ—

আপন বাসা?

নীহারিকা হেসে ফেললেন।

কিন্তু ধর সেখানে যদি তোমার কোনো ছেলে মরে যায়—

বিতান! নীহারিকার গলা সাদা পৃষ্ঠার মতো কেঁপে ওঠে। তোরা আমার বাড়ির স্বপ্ন এভাবে ভেঙে দিবি! তাঁর গলা ছুঁয়ে ঝরনাটি উঠে আসে চোখে। নীহারিকা কাপড়ে মুখ ঢাকেন। শোনা যায় শিকনি টানার শব্দ। নীহারিকার ফ্যাসফ্যাসে গলা। নতুন বাড়িটা শুধু আমার চাওয়া নয়—

তাহলে কী মা? বিতান নীহারিকার পিঠে তার থাবা মেলে দেয়।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না নীহারিকা। তারপর একটা একটা শব্দ তার মুখ থেকে ছড়িয়ে যায়, আ—কা—ং—খা—

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি মা—এমনই মুখ ফস্কে—

তুই তো এভাবেই বলিস চিরদিন—

বিতান চুপ করে যায়।

ঘুমোতে যাবি না?

কটা বাজল?

বারোটা বেজে গেছে নির্ঘাত—

তাহলে আরো একটু থাকি।

মাদুর আর বালিশটা নিয়ে আসি। এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাক।

তোমার বাড়ির সব জানলাগুলোয় রঙিন কাঁচ লাগিও, মা—

বাড়ির কথা থাক।

চাল বেটে তুমি যেমন আলপনা দিতে—সিঁড়িতে তেমন ফুল-লতা-পাতা এঁকে দিও—

বাড়ির কথা থাক। তুই শুবি চল।

একটা লাউমাচাও করতে পার—

বাড়ির কথা থাক। অনেক রাত হল।

বা লঙ্কার গাছ। লাল-লাল ফুলের মতো লঙ্কা—

সবটাই বুঝি আমাকে সাজাতে হবে? নীহারিকা শ্লেষে হাসলেন। আর তোরা? বাড়িটা কি তোদের নয়?

বিতান ছাদের উপরেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে।

তুই যে নোংরাতেই বসে পড়লি—কতদিন ঝাঁট পড়ে নি—

নীহারিকার দিকে চেয়ে থাকে সে। ছাদের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেঁড়া কাগজ, শুকনো পাতা, পালক—যেন কোনো মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্কের ভিতরে বসে আছে সে। শান্তিপর্বের ভিতরে? যেখানে বিষাদ এসে জয়ের মুখোমুখি ভাঁড় হয়ে নাচে, বিতান ভাবছিল, যেখানে স্বাধীনতা পরিণত হয় দহনে। তবু এই শান্তিপর্বের শ্মশানে তার পাশে তো নীহারিকাও আছেন—হয়তো দশ হাজার বছর আগে নীহারিকার নক্ষত্রমণ্ডলী ভেঙে গেছে—তার আলো বিতানের পাশে এখনও জেগে আছে।

নীহারিকাও বসে পড়েন বিতানের পাশে।

তুই তো কোনোদিন কিছু বলিস না—

বিতান চুপ করে থাকে।

আগেও যখন এখানে থাকতিস, একা-একাই থাকতিস। কখনো জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলিস নি তুই—

কী? বিতান হাসে।

নিজের কথা। বল তুই, সেধে কোনোদিন আমার কাছে একহাতা ভাত বেশি চেয়েছিস তুই?

তাতে কী?

মানুষ তো কাউকে কিছু বলে—

কাকে?

আমাকে তো বলতে পারিস তুই।

ও কিছু না। ও তুমি বুঝবে না।

কেন, তুই কত আগামী যুগের? তোর ছেলের মেয়ের চেয়েও? তোর নাতির চেয়েও?

হাওয়ার ভিতরে বিতানের হাসি কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

তুমি দেখছি কথার শিরোমণি হয়ে উঠেছ, মা—

আমি তো তোর পেটে জন্মাই নি।

বিতান আবার হো-হো করে হেসে ওঠে।

পেটে ধরেছ বলেই বুঝি—

কী?

রক্ত দিয়ে সব কিছু বোঝা যায় না, মা।

তাহলে কী দিয়ে! বল তুই—আমি সেভাবেই বুঝব।

আমি জানি না। আচ্ছা মা, চাকরিটা আমি কেন ছেড়ে দিয়ে এলাম তা তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন?

তুই তো উত্তর দিতিস না—

তবু জিজ্ঞেস করতে তো পারতে।

কী লাভ?

আচ্ছা, যদি তোমায় উত্তর দিতাম—তাহলেও কি আমাদের বোঝাবুঝি সম্পূর্ণ হত?

তুই যেন অনেক দূরে সরে গেছিস—

তুমি তোমার মা-বাবার থেকে এতখানি দূরে সরে গিয়েছিলে কোনোদিন?

নীহারিকা চুপ করে থাকেন।

আচ্ছা, এই পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

হ্যাঁ—

তুমি চলে গেলে তো এ বাড়িটা আর ঠিক এভাবে বাঁচবে না—

নীহারিকা বিতানের দিকে চেয়ে থাকেন।

জান মা, এই তিন বছরে, ওখানে আমি বার দশেক বাড়ি বদলেছি। সত্যি বলছি, প্রত্যেকটা বাড়িতেই কেমন ভূতের ভয় পেয়ে বসত আমায়।

ভূতের ভয়? চিঠিতে তো লিখিস নি কোনোদিন—

দারুণ ভয় হত। রাত্তিরে শুলেই মনে হত, কারা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। পুরোনো সব বাড়িরা ভূতের মতো তাড়া করে ফেরে।

কী আবোল তাবোল বকছিস! এত রাত্তিরে তোর মাথায় ভূত চেপেছে। চল, শুবি চল।

বিতান আবার হেসে ওঠে।

তুমি ভয় পেয়ে গেছ, মা?

তোর শরীরে কোনো কষ্ট হচ্ছে?

না তো—

কোনো কষ্ট নেই?

না—

তাহলে এমন বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলছিস কেন তুই?

বিতান দেখল নীহারিকার মুখ কিরকম কুয়াশায় মতো আবছা হয়ে যাচ্ছে। সেই কুয়াশার মধ্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনেক জেটপ্লেন, উড়ুক্কু মাছ আর অরকিডের শেকড়।

মা, ওই বাড়িগুলোতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম খুব—

কেন?

ভূত ছিল—

কাদের ভূত?

গত একশ বছরে যেসব সময় মরে গেছে—

তোর শরীর খারাপ লাগছে ?

না, শোনো না—তোমাদের মা বাবা তো তোমাদের জানত—

হ্যাঁ—

তোমরাও তাদের জানতে—

হ্যাঁ—

তার আগের পুরুষেও জানত—

হ্যাঁ—

তারও আগের পুরুষ—

হ্যাঁ—

তাহলে এতদিনের জ্ঞান—জ্ঞানের ভূত—

তোর শরীর খারাপ লাগছে ?

আমি এত মৃত জ্ঞান নিয়ে কী করব বলতে পার, মা ? কথাটি বিতানের গলার ভিতরেই ডুবে যায়। নীহারিকার কানে পৌছয় না। বিতান জানে, কোনোদিন পৌছবে না।

হৃদয়পুরের জমিটা যদি সত্যিই কেনা যায়—

ওসব কথা থাক। তুই এবার ঘুমিয়ে পড়বি চল।

নতুন বাড়িটা সেই স্টেশন থেকে কতদূরে হবে ?

আগামী প্রজন্ম ও রবীন্দ্রসংগীত

তপোব্রত ঘোষ

১.

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে একটি মুখ-লুকানো অসামান্য কবিতা আছে, কবিতাটির নাম, 'একজন লোক'। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

আধবুড়ো হিসুস্তানি,
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।···

পথিকটিকে দেখা গেল,
আমার বিশ্বের শেষ রেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায়;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে;
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক।

বিচিত্রপথে গেলেও সর্বত্রগামী হতে না পারার সেই সর্বজনপরিচিত স্বীকারোক্তি এখানে কী গভীর আর্তিতে ভরে যায়! তিনি তো পারেন নি ওই অনভিজাত লোকায়ত মানুষটির অন্তর্লোকে কোনো ফসল ফলাতে—তাই তাঁর ঠাঁই হল ওই লোকটির 'জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়'। এমনকি পাওনাদার কাবুলিওয়ালারও একটি প্রাসঙ্গিকতা আছে ওই লোকটির জীবনে। কিন্তু বিশ্বখ্যাত রবিঠাকুর তার কাছে নিতান্তই 'একজন লোক'। কুয়াশা যখন হল 'নীল কুয়াশা' তখন অস্পষ্টতার সঙ্গেই সংযুক্ত হল অসেতুসাধ্য এক দূরত্বের ভাব। ওই মাটি-ঘেঁষা মানুষটির কাছে সম্পূর্ণ 'নেই' হয়ে হারিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ কোন্ দূরে—কোন্ নির্বাসনে! নিজের বাঁশির সুরে বিশ্বের সমস্ত ধ্বনির সাড়া-জাগানোর বিনম্র সংকল্প ছিল যাঁর—নিজের প্রতি এই তাঁর এক করুণ আত্মধিক্কার।

২.

আগামী প্রজন্মে রবীন্দ্রসংগীতকে কি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে না ওইসব মানুষদের কাছে? বিগত অর্ধ-শতাব্দীর রবীন্দ্রসংগীত শোনার ইতিহাসের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন দেখতে পাই, দিলীপকুমার যাকে বলেছিলেন 'সাড়ার বৃত্ত' তার পরিধি ক্রমশই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে। প্রথমে যা ছিল নিতান্তই ঠাকুরবাড়ির অন্তরঙ্গমহলের গান, তা হল ব্রাহ্ম-সমাজের গান, তারপর উচ্চকোটির বিদগ্ধসমাজের গান, আর আজ তা সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত-সমাজের গান। কিন্তু এই চৌহদ্দিটুকুও কি পেরিয়ে যেতে পারবে না আগামী দিনের রবীন্দ্র-সংগীত?

মনে পড়ছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এপারের রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী যখন ওপারে গান গেয়ে ফিরছিলেন তখন ধলেশ্বরী খেয়াঘাটের মাঝি তাঁর কাছে নদীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল, 'এ সেই "বাঁশি" কবিতার ধলেশ্বরী।' বলা বাহুল্য, তিনি মুগ্ধ, চমৎকৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু "বাঁশি" তো গান নয়—কবিতা। শব্দার্থই তার সম্বল। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রসংগীতও মূলত শব্দার্থনির্ভর; মার্গসংগীতের মতো তা 'অর্থভারহীন' সপ্তসুরের আকাশবিহার নয়; আর এই অর্থেই তা মিশ্রশিল্প। কিন্তু সুরের সংস্পর্শে রবীন্দ্রসংগীতের সেই শব্দার্থ কি কবিতার তুলনায় আরো অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারে না ওই 'নীল কুয়াশা'র ব্যবধান? নিশ্চয় পারে। রবীন্দ্রকবিতার তুলনায় রবীন্দ্রগানের সঞ্চারণক্ষমতা নিঃসংশয়ে অনেক বেশি। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। বাঙলা ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক বিদেশী শ্রোতা 'কোথা যে উধাও হল' শোনার পর শিল্পীকে এসে জানান যে কথার মানে বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও এই গান শুনে বর্ষাপ্রকৃতির একটি উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। অর্থাৎ 'কথার মানে'টাও কিন্তু একরকমভাবে ওই বিদেশীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

কিভাবে যাচ্ছে? গানের আছে এক নিজস্ব আন্তর্জাতিক ভাষা যা মানুষের 'সামাজিক ভাষা'র চেয়ে বহুগুণে বেশি অর্থপরিবাহী। এই বিশ্বব্যাপকতার গুণেই কি রবীন্দ্রসংগীত এবার নেমে যেতে পারে না 'আপনার উচ্চতট' থেকে?

৩.

এখানে নিশ্চয় সংগত আপত্তি উঠবে এই বলে যে, সুরনির্ভর বাক্‌শিল্পের বিশেষ সঞ্চারণক্ষমতা স্বীকার করে নিলেও ওই বাক্‌শিল্পের আস্বাদনের জন্য ন্যূনতম একটি শিক্ষাদীক্ষার পরিশীলন থাকা প্রয়োজন। আর এই জায়গাটিতে এসে আমরা বরাবর রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী করে এসেছি; বলেছি, তিনি কেন গানের ভাষা রচনায় নিজেকে সাধারণের সমস্তরে নামিয়ে আনতে পারেন নি? মূলত এই দৃষ্টিকোণেই ১৯৪৪ সালে অর্থনীতির অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলে-ছিলেন যে দেশের বৃহৎ গ্রামসমাজের মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীত সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, অবাস্তব।

কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে নীচের মানুষদের বোধগম্য করে তোলার জন্য নিজের শিল্পের ভাষাকে সচেতনভাবে proletarianize করা শিল্পীর অবশ্যকৃত্য নয়। তিনি নির্মাতা নন, স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টি organic বা জীবধর্মী—তাকে কেটে ছিঁড়ে জোড়া লাগিয়ে অদলবদল করা চলে না। এই সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যই, কিন্তু যাতে সেই দশজনে মেঘদূতে নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের।'

আমাদের মধ্যে যাঁরা নাগরিক, শিক্ষিত এবং রসিক তাঁরাই রবীন্দ্রসংগীতের ঐ 'দশোত্তরবর্গ'। রবীন্দ্রসংগীতকে গণ্ডিবন্ধনমুক্ত করে দশজনের মধ্যে বিস্তীর্ণ করে দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব, রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব নয়।

এই বিষয়ে বরং বর্তমান প্রজন্মের সুবিধা অনেক বেশি। রাধাকমলের যুগের গ্রাম আর আজকের গ্রামের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। নানাভাবে গ্রামসংস্কৃতি আর নগরসংস্কৃতির ব্যবধান কমেছে। বিশেষত এ যুগের একাধিক প্রচারমাধ্যমগুলিও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তা ছাড়া, গ্রামে শিক্ষাবিস্তারে যে চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে তার কথাও মনে রাখতে হবে। যদি এইভাবে পরিবর্তন হতে থাকে তবে আরো পঞ্চাশ বছর পরে গ্রামের মানুষের রসবোধ যে আজকের তুলনায় অন্তত কিছুটা পরিমার্জিত হয়ে উঠবে—ভরসা করে এই অনুমান করা চলে। রাধাকমলের অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্র-নাথ বলেছিলেন, 'আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না, কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি'।

৪.

এই প্রসঙ্গে 'ইন্দিরা'-প্রযোজিত প্রথম বার্ষিক রবীন্দ্র-সংগীতসম্মেলন (১৯৮৪) উপলক্ষে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে দেবাশিস দাশগুপ্ত-র একটি অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, 'বহরমপুরে একটি জায়গায় রক্তকরবীর মহলা চলছিল, আবহমানকালের নিয়মমতো অনেক উৎসাহী লোক জানলা দিয়ে দেখছিল—তার মধ্যে কিছু আদিবাসী সাঁওতালও ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা মাদলবাঁশি সহযোগে নিজেরা উৎসবে, আনন্দে রক্তকরবীর গান গাইতেন···।'

এই ঘটনাটির উল্লেখ করে দেবাশিস জানিয়েছেন যে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কোনো সাঁওতালকে খোয়াই-এর দিকে যেতে যেতে আনমনে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে তিনি শোনেন নি। এরপর তাঁর অর্থগূঢ় মন্তব্য 'পাঁচিল বড়ো সাংঘাতিক জিনিস।'

কিন্তু পাঁচিল-ভাঙার চেষ্টাও শুরু হয়েছে; আর তা হয়েছে খোদ শান্তিনিকেতনেই। ১৯৮৬ র 'রবিতীর্থ'র বার্ষিক উৎসবের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত "রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা" প্রবন্ধে শান্তিদেব ঘোষ প্রশ্ন করেছেন, 'সংখ্যায় অধিক যে বৃহৎ অশিক্ষিত সমাজের মানুষ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে, সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের সমাদর কতটুকু? এই গ্রাম-সমাজের মানুষেরা যে গান-প্রিয় নয় এ কথা কেউ বলতে পারবেন না। দক্ষিণ থেকে উত্তর-বাংলা পর্যন্ত গ্রাম-সমাজের মানুষ যে কত প্রকৃতির গান ও নাটকের গান বছরের পর বছর এখনও রচনা করছে, গাইছে এবং শুনছে তার সংখ্যার সীমা নেই। এই গান-প্রিয় গ্রাম-সমাজের মানুষের কাছে সহরবাসী শিক্ষিতসমাজ এখনও যে গুরুদেবের গানকে পৌঁছে দিতে পারে নি, সে কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? এবং এখনো কেন যে আমরা তা পারি

নি, তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় আজ এসেছে বলেই আমি মনে করি।'

শান্তিদেব স্বয়ং তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে ব্রাত্য-সমাজের মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীতকে পৌঁছে দেবার এক সুকঠিন সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন। পার্থ বসু সম্প্রতি ["প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে"/'দেশ' ৩ ফাল্গুন, ১৩৯২] জানিয়েছেন, 'শান্তিদেব এখন যত নিরক্ষর বাউলদের ডেকে ডেকে এনে তাঁর গুরুদেবের গান তাদের কণ্ঠে তুলে দিতে নিরলস শ্রম করে চলেছেন। এখন আবার ভাবছেন, গুরুদেবের গানের সঙ্গে দেশি যন্ত্র-সংগতের কথা। ঢোলক, গুব্‌গুবা বা সারিন্দা—এসব গুরুদেবের তেমন গানের সঙ্গে বাজিয়ে দিলে কেমন হয়?'

৫.

কিন্তু আগামী প্রজন্মে আভিজাত্যের তুঙ্গশিখর ছেড়ে রবীন্দ্রসংগীতের একটি নির্বাচিত ভগ্নাংশই কি তবে নেমে আসবে মাটির কাছাকাছি? শুধুই বাউল-কীর্তন-সারি-ভাটিয়ালির সুরে বাঁধা তথাকথিত সহজ ও দেশজ রবীন্দ্রসংগীত? আর এদেশের জলবায়ুর পক্ষে অনিবার্য ছুঁৎমার্গে গীততিবান কি তখন দু-টুকরো হয়ে যাবে? একভাগে যাবতীয় 'গণমুখী' ও 'প্রগতিশীল' রবীন্দ্রসংগীত জড়ো করে বাকিগুলি সরিয়ে রাখা হবে অন্যভাগে? নৈতিক গোঁড়ামির বদলে রাজনৈতিক গোঁড়ামি থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যকে bowdlerize করবার যে প্রবণতা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, আগামী প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া আর শোনার ক্ষেত্রেও কি তা প্রবলতর হয়ে দেখা দেবে? তখন কি এমন অদ্ভুত কথা বলা হবে যে 'আমরা চাষ করি আনন্দে' আসল রবীন্দ্রসংগীত, আর 'জগতে তুমি রাজা অসীমপ্রতাপ' সামন্ততান্ত্রিক রবীন্দ্র-সংগীত আর সেই কারণেই পরিত্যাজ্য?

আমি আশা করব সেই বিমূঢ়তার সর্বনাশ থেকে রবীন্দ্রসংগীত রক্ষা পাবে। বরং রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াও ভালো, এইভাবে তাঁকে পছন্দ-সই টুকরো করার চেয়ে।

অনেকেই হয়তো এখানে বলবেন, ধ্রুপদ টপ্পা বা কঠিনরাগভিত্তিক ও ভাষার সূক্ষ্মব্যঞ্জনায় পূর্ণ রবীন্দ্র-সংগীতের চেয়ে সহজ সুরে বাঁধা সহজ কথার রবীন্দ্র-সংগীতই হাটেবাটে ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত। কাজেই আগামী প্রজন্মে রবীন্দ্রসংগীতকে যদি সর্বজনের মধ্যে সম্প্রসারিত করতেই হয় তবে আপনিই এর মধ্যে একটি বিভাজন গড়ে উঠতে বাধ্য।

রাগসংগীতের সুরগুলি আদিম লোকসংগীত থেকেই বিবর্তিত হয়েছে—এইরকম একটি মত আধুনিক সংগীত-গবেষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ কথার সত্যাসত্য বিচারে আমি অনধিকারী; কিন্তু যদি মনে করা হয় যে সুর আর কথার শিল্পিত সূক্ষ্মতা শুধু বিশেষ একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই অনুভববেদ্য—তবে আমি আপত্তি করব। কারণ রসবোধ স্বভাবে থাকাটাই হল আসল কথা; শিক্ষা বা চর্চা তাকে মার্জিত করতে পারে মাত্র, তার বেশি নয়। সুপণ্ডিত অথচ সীমাহীনভাবে অরসিক আমরা প্রতিদিন ভূরি ভূরি দেখতে পাই। সত্যি কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলে দিয়েছেন—রাজার ছেলে আর চাষার ছেলের মধ্যে পার্থক্য রসবোধ থাকা না-থাকা নিয়ে নয়; আসলে রাজার ছেলের রসচর্চার সুযোগ আছে, চাষার ছেলের তা নেই। সেই সুযোগ দিতে পারলেও চাষার ছেলে শুধু চাষার ছেলে বলেই রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে পারবে না, পারবে শুধু এর একটি ভগ্নাংশকে—এ কথা অশ্রদ্ধেয়। কীর্তনসংগীত কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙলার গ্রামেগঞ্জে যথেষ্ট জনপ্রিয়, অথচ এর সুরের কাঠামো এবং ভাষার নাট্যলীলায়িত ভাবব্যঞ্জনা খুব সহজ আর সাদামাটা নয়।

আসলে রবীন্দ্রসংগীতে মানুষের যে ভাবলোক উন্মীলিত হয়েছে—যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হোক না কেন—নিখিল-মানুষের হৃদয়েই তার মূল রয়েছে। দেবাশিস যে আদিবাসী সাঁওতালদের 'রক্তকরবী'র

গান-গাওয়ার কথা লিখেছেন, তারা কি শুধু 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছেই' গাইত? 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার' অন্তত গাইবার চেষ্টাও করত না?

৬.

বরং মনে হয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নাগরিক মানুষের চেয়ে গ্রামীণ মানুষের পক্ষেই রবীন্দ্রসংগীতের মর্মে প্রবেশলাভ বেশি সহজ।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ত্রিশের দশকে লীলা মজুমদার যখন শান্তি-নিকেতনে শিক্ষকতা করতেন তখন একদিন রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন গ্রামের দিকে; খেতে ধান পেকেছে, সেই পাকা ধানের মঞ্জরীর উপর দিয়ে যখন হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে—একটানা অদ্ভুত মৃদুমধুর শব্দে ভরে উঠেছে সমস্ত মাঠ। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে তোমরা শহরের মেয়ে, কোনো-দিন তো শোনো নি এ জিনিস—আমি এর নাম দিয়েছি ধানের গান।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় একটি রবীন্দ্রসংগীত: 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে'। এর সঞ্চারী-অংশে আছে 'শস্যক্ষেতের সোনার গানে / যোগ দে রে আজ সমান তানে'। যারা শহুরে মানুষ, ইটের টোপর মাথায় পরা শহর কলিকাতার বাসিন্দা, 'ধানের গান' কাকে বলে কস্মিন্‌কালে জানে না, তারা কী করে বুঝবে 'শস্য-ক্ষেতের সোনার গানের' মর্ম? ধানের গানের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাকা ধানের পীত-স্বর্ণাভা—'ধানের গান' হয়ে উঠছে 'সোনার গান'। গ্রামের মানুষের পক্ষেই তো এ বেশি সুগম।

গ্রাম থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ। টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে···একেবারে চোখের ঘুমের মতো'। মনে পড়ে যায় আমাদের 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ' গানটির কথা। এর সঞ্চারীতে আছে 'তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল / আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল'। শহরের ক-জন মানুষ 'চোখের ঘুমের মতো শিরীষ ফুল' দেখেছে?

গ্রাম থেকে লেখা আর-একটি চিঠিতে বর্ষাগমের এই ছবি 'বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ শব্দে সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে।' সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের স্মৃতিতে জেগে ওঠে এই গান:

"পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসি।
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ওই শুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরন নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী॥"

সমস্ত গানটিতে জলস্থলআকাশ ব্যাপ্ত করে যেন জমে উঠেছে গেঁয়ো সাপুড়ের সাপ-খেলাবার আসর।

কিংবা বোলপুর থেকে লেখা এই চিঠি 'প্রথম শীতের আরম্ভে···বাতাসটা হী হী করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে'—এই দৃশ্য যে না দেখেছে 'শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা/আমলকী বন মরণ-মাতা —গানের এই পঙক্তির 'মরণ-মাতা' শব্দের মর্ম সে বুঝবে কী করে? এখানেও গ্রামীণ মানুষেরই জিত।

রবীন্দ্রসংগীতে এইরকম অজস্র ও অপূর্ব pastoral

image বা লোকজীবন-সম্পৃক্ত রূপকল্প রয়েছে যাদের সম্পূর্ণ ও সার্থক উন্মোচন সেইসব ভবিষ্যৎ গায়কদের প্রতীক্ষা করছে যাদের চোখ আর মন নাগরিক কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি, যাদের বাসা 'মাটির কাছাকাছি'।

৭.

আজকের প্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী ও শিক্ষকদের সামনে একটি স্বপ্নময় প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তাঁরা যদি দলমতনির্বিশেষে একত্রিত হয়ে কলকাতা বা মফসসল শহর থেকে দূরবর্তী কিছু-কিছু পাড়াগাঁ বেছে নিয়ে এক-একটি মণ্ডল গড়ে তোলেন, প্রত্যেক মণ্ডলে যদি স্থাপন করেন রবীন্দ্রসংগীতের এক-একটি প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে মাসের অন্তত একটি দিন বিনা-দক্ষিণায় এক-একটি কেন্দ্রে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দিতে সম্মত হন, তবে কেমন হয়?

রবীন্দ্রসংগীতের কাছ থেকে তাঁরা অনেক পেয়েছেন; বিনিময়ে যদি এই স্বার্থত্যাগটুকু তাঁরা করতে পারেন তবে সেটিই হবে আগামী প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীতরসিক-সমাজের কাছে বর্তমান প্রজন্মের মহত্তম কৃত্য।

ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমিকা—এ. আর. দেশাই। কে. পি. বাগচী, কলিকাতা। পৃ ২৩—৪০০। পঁয়ষট্টি টাকা।

গ্রন্থটি লেখকের The Social Background of Indian Nationalism-এর বঙ্গানুবাদ। ব্রিটিশ আমলে ভারতে সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ানির্ণয় এবং সেই পটভূমিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপরেখা উপস্থাপন করাই গ্রন্থটির ঘোষিত উদ্দেশ্য। মূল গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকানুযায়ী লেখক ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন।

লেখকের মতে, ব্রিটিশ শাসনের আগে শতাব্দীকাল ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক ভিত্তি। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামপঞ্চায়েত দ্বারা কৃষকদের মধ্যে ভাগ-ভাগ করে জমিবণ্টন, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি, অপরিণত শ্রমবিভাগ, বহির্জগতের সঙ্গে বিনিময়ের প্রায় অনুপস্থিতি আর 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব'। অর্থনীতিতে পরিবর্তনহীন গ্রামের প্রাধান্যের ফলে বাণিজ্য এবং শহরে শিল্পের ভিত্তিতে বুরজোয়া সমাজের উদ্ভব সম্ভব হয় নি। ভারত অসংখ্য সামন্তরাষ্ট্রে বিভক্ত থাকায় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধেও কোনো ধারণা দানা বাঁধে নি।

ব্রিটিশ অধিকারের ফলে ভারতে সমাজচিত্র পালটায়। সামন্তপ্রথা থেকে ভারত ক্রমশ মূলধনী অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়, যে মূলধনী ব্যবস্থায় কিনা ভারতীয় জাতির উদ্ভব। এই পরিবর্তনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান ইংরাজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা এবং দেশজ কুটিরশিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তি ও আধুনিক শিল্পের আবির্ভাব। প্রথমটির ফলস্বরূপ দেখা যায় ভূমির উপর গ্রামসমাজের চিরন্তন অধিকার লোপ, জমির মালিকানাপ্রাপ্ত জমিদার-শ্রেণীর উদ্ভব, জমি কেনাবেচার সূত্রপাত, মহাজনের প্রাদুর্ভাব এবং তার প্রভাববৃদ্ধি, জমির বিভাজন আর খণ্ডীকরণের বিপুল প্রবণতা, কৃষক উচ্ছেদ, ভূমিহীন খেতমজুর আর ভূমিদাসের উদ্ভব এবং কৃষির উন্নতি বিষয়ে অনুপস্থিত-জমিদারের ঔদাসীন্য। অন্যদিকে ভারত

গ্রন্থসমালোচনা

ব্রিটেনের শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত হয় এবং ভারতীয় পণ্যের স্বার্থবিরোধী শুল্কনীতি আর যন্ত্রোৎপন্ন সস্তা জিনিসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার চাপে ভারতের ঐতিহ্যময় কারিগরি শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটলে কর্মহীন কারিগর ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে কৃষিতে চাপ বৃদ্ধি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করলেও এইসব শিল্পে ব্রিটিশ আর্থিক মূলধনের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। লেখকের মতে, এই পুনঃশিল্পায়ন মন্থর, ব্যাহত এবং ভারসাম্যহীন।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভারতে শ্রেণীকাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। নব্য জমিদার শ্রেণী, যাদের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত ভূস্বামী, মাঝারি আর ছোটো স্বত্ববান কৃষক, আধুনিক মহাজন শ্রেণী, আধুনিক বণিকশ্রেণী, 'শিল্পগত বা অর্থগত' মূলধনী শ্রেণী এবং আধুনিক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইংরাজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে তার প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের প্রগতি এর লক্ষ্য না হওয়ায় ১৯৩১ সালেও নিরক্ষরতার হার ছিল ৯২ শতাংশ। একান্ত প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা ছিল অবহেলিত। তবু কতিপয় ভারতীয়কে অন্তত ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতা আর যুক্তিবাদের শিক্ষা দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়তাবাদের বিকাশকে কিয়দংশে সাহায্য করে।

ভারতের এই উপনিবেশে রূপান্তর ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আর বিকাশকে নির্ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ শাসন একদিকে সমগ্র ভারতকে একটি অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এককে পরিণত করে পরোক্ষভাবে জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছিল, অপরদিকে জাতীয় অগ্রগতির পথে সাম্রাজ্যবাদী প্রতি বদ্ধকতা সৃষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবিরোধী করে তুলেছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মনোভাবের শ্রেণীবিশেষে তারতম্য ছিল—শ্রেণীস্বার্থানুযায়ী। জমিদাররা ছিলেন অধিকাংশক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্তাবক, যখন কিনা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সব রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। ভারতীয় বুরজোয়াদের মধ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ী স্বার্থের বিশেষ সুযোগের নিন্দা করলেও

আধুনিক শিল্পপতি শ্রেণীই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সত্যকার সংগ্রামী বিরোধিতা করেছেন, কারণ শেষোক্ত-দের কাছে ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক-ভাবে আরও শ্বাসরোধকারী ছিল। শ্রমিকশ্রেণী আবার শুধু স্বাধীন ভারত নয়, স্বাধীন সমাজতন্ত্রী ভারত কামনা করতেন। প্রজাদের থেকে আরো স্বত্ববান কৃষকরাই জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি কর-দাতাগ্রহীতার সম্পর্কের কারণে। কিন্তু কৃষকদের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা অধিকাংশ কৃষক-আন্দোলনের সংগ্রামী সম্ভাবনাকে করেছিল সীমিত। আবার সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যে জাতীয় চেতনা সত্ত্বেও প্রতি ক্রিয়াশীল প্রবণতা খুব স্পষ্ট ছিল। কিন্তু শ্রেণীমানসিকতার এই স্বাভাবিক আড়াআড়ি ছককে ভারতে জটিল করেছিল জাতপ্রথা, যা অনেক ক্ষেত্রেই খাড়াখাড় আনুগত্যের সৃষ্টি করত। তবে লেখকের মতে, নানা নতুন সংগঠন ও নতুন চেতনা জাতসচেতনতাকে আলোচ্য কালপর্বে অনেক দুর্বল করে দিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশকে লেখক নিম্নলিখিত পর্যায়সমূহে বিভক্ত করেছেন—(ক) ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫—উদারনৈতিক, নিয়মতান্ত্রিক, বুদ্ধিজীবী-পরিচালিত বণিকশ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট এবং খুব সীমিত দাবির পর্যায়; (খ) ১৯০৫ থেকে ১৯১৮—বেকারি এবং আর্থিক অবনতির সম্মুখীন মাঝারি ও নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণদের বিপুল সমর্থনপুষ্ট চরমপন্থী নেতৃত্বের স্বশাসনের লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলনের পর্যায়; (গ) ১৯১৮ থেকে ১৯৩৪—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণভিত্তি প্রসারের, গান্ধীর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিসটদের আত্মপ্রকাশের পর্যায়; (ঘ) ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯—কংগ্রেসের ভিতরে আর বাইরে গান্ধীর নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পের সম্ভাবনা সৃষ্টি ও গান্ধীবাদী মতবাদের কিছু ক্ষেত্রে বিকল্পের উদ্ভব ও কিছু ক্ষেত্রে বিকাশ, এবং অবনত কিছু গোষ্ঠী, জাত ও কিষাণসভাসমর্থক কৃষকদের কংগ্রেসানুসারী না থেকে নিজস্ব গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত স্বতন্ত্র নেতৃত্ব অনুসরণের পর্যায়। শেষোক্ত পর্যায়ে, তবুও, সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীর নেতৃত্বই বলবৎ থাকে এবং আন্দোলন বহুলাংশেই মূলধনী ও বিত্তশালীদের স্বার্থানুসারী থেকে যায়।

তবে, জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী প্রবণতাগুলিও লেখকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ, এবং ১৯৪৬ সালে বসে গ্রন্থের উপসংহারে লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা তীব্রতর হবে। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর মূলধনী তথা বিত্তশালীদের স্বার্থের নিয়ন্ত্রণ বলবৎই থাকবে।

গ্রন্থটি ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙলার মাধ্যমে ইতিহাস-পাঠরত স্নাতক (সাম্মানিক) পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে, বিশেষত গ্রন্থটি যখন এই বিষয়ের উপর মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত আদিগ্রন্থগুলির অন্যতম এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর বোধগম্য। তবে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীর জন্য বইটি সুপারিশ করতে দ্বিধা হয়। কারণ আজ আমাদের দেশে ইতিহাসচর্চা যতটা পরিণত তার পক্ষে গ্রন্থের বক্তব্য অতিসরলীকৃত। তড়িঘড়ি সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি তৈরি সর্বজনীন বিশ্লেষণ-কাঠামোয় একটা দেশের সামাজিক রূপান্তরকে যান্ত্রিকভাবে চেপেচুপে আঁটিয়ে দেওয়া তো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নয়। এই পথিকৃৎসুলভ তাড়াহুড়ো হয়তো প্রথম সংস্করণে ক্ষমার্হ, কিন্তু পঞ্চম সংস্করণ (১৯৭৬) প্রকাশকালে লেখক সমসাময়িক ইতিহাস চর্চার আলোয় আগে-এড়িয়ে-যাওয়া জটিলতার জট আরও মার্জিত এবং নিপুণ ভাবে কেন খুলতে সচেষ্ট হলেন না বুঝি না! অথচ ইতিহাসপ্রক্রিয়ায় সমস্ত জটিলতা স্বীকার করে তার কার্য-কারণবিশ্লেষণক্ষমতা এবং সাধারণ আর বিশেষের দ্বন্দ্বেই যে এক-একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—এই সচেতনতাই বোধহয় অন্যান্য বিশ্লেষণ-পদ্ধতির তুলনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উৎকর্ষের একটি প্রধান কারণ। যান্ত্রিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত: লেখক ব্রিটিশ ভারতে নানা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আর প্রতিষ্ঠানের (যেমন ভূমি-দাসপ্রথা) অস্তিত্ব মেনে নিয়েও বা ব্রিটিশ আমলে জাতপ্রথার প্রবল অস্তিত্ব স্বীকার করেই পরমুহূর্তে সমীকরণ মেলানোর জন্য দাবি করেছেন ব্রিটিশ আমলে ভারত মূলধনী অর্থ-নীতিতে রূপান্তরিত হয় বা বিংশ শতাব্দীতে জাতসচেতনতা স্তিমিত হয়ে আসে। এ ছাড়া, ভারতে ব্রিটিশ শোষণের পর্যায় ভাগ না করায় এবং সবিস্তারে এই পর্যায়গুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে জাতীয়তাবাদের চরিত্র নির্ধারণে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা নির্ণয় না করায়ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকে লেখক বিচ্যুত হয়েছেন।

আর পর্যায় নির্দেশ না করায় মনে হতে পারে, ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ একটি পরিবর্তনহীন অনড় ব্যবস্থা। তাহলে তো ঔপনিবেশিকতার ফলস্বরূপ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, পরিবর্তনহীন, অনড় বিষয় হিসেবে দেখতে হয়। আলাদা-আলাদা ভাবে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন, জাতপ্রথাবিরোধী আন্দোলন, জাতভিত্তিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন, সমাজসংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচিত হওয়ায় এদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বুনুনি এবং দ্বন্দ্ব, যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারা নির্ধারণ করেছিল, তার সম্যক আভাস পাওয়া যায় নি, আর ঐতিহাসিক প্রবহমানতার বোধও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তারপর গান্ধীর আমলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও সদস্যদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিস্তারিতভাবে আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হয় নি। তবে সত্যিই পীড়াদায়ক হল প্রথম সংস্করণে যেসব ধারণা—প্রাকব্রিটিশ ভারতে ভূমির মালিকানা, গ্রামসমাজের অধিকার ও ভূমিহীন কৃষকের উপস্থিতি অনুপস্থিতি এবং ব্রিটিশ আমলে এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংক্রান্ত—স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন ১৯৭৬-এর পঞ্চম সংস্করণেও পরম নিশ্চিতভাবে পুনরায় তাদের স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন; ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে এইসব বিষয়ে প্রচুর গবেষণার ফলে পুরোনো ধারণাগুলো টলে গেলেও লেখক সেইসব বিকল্প মতের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এ ছাড়া, তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিপীড়িত শ্রেণীর যোগদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্যান্য বহু সমকালীন গ্রন্থের মতো আসলে নিপীড়িতদের আন্দোলনে কেবলমাত্র কংগ্রেস বা কমিউনিসট নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন, নিপীড়িতদের নিজস্ব ভূমিকা বা চেতনা নয়।

তবু, আজও গ্রন্থটিকে পুরোপুরি খারিজ করা যায় না। কারণ, গোড়া থেকে দৃঢ়ভাবে একটিমাত্র বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকায় গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের ব্রিটিশ ভারত ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা দিতে সক্ষম, কোনো ধোঁয়াটে খণ্ডিত আভাস নয়।

সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয় কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন

অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা—নবার্ক, ডিসি ৯৪ শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা-৫৯। বাইশ টাকা।

অরুণ মিত্রের জন্ম ১৯০৯-এর ২রা নভেমবর। জন্মসালের হিসেবে তিনি তিরিশ-দশকের কবি যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রান্তরেখা" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩-এ। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকালের দিকে তাকালে তিনি চল্লিশ-দশকের। তাঁর কবিতা রচনার সূত্রপাত সম্ভবত ১৯৩৪-এ, যদিও লেখকসত্তার প্রথম প্রকাশ তার আগে, ১৯২৯-৩০ নাগাদ। রিপন কলেজের ম্যাগাজিনে আলফঁস দোদে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "উৎসের দিকে" বেরোয় বারো বছর পরে ১৯৫৫ সালে। কবির তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে—নাম" ঘনিষ্ঠ তাপ"। এর পরে বেরিয়েছে "মঞ্চের বাইরে মাটিতে" ১৯৭০ সালে, "শুধু রাতের শব্দ নয়" ১৯৭৮-এ, "প্রথম পলি শেষ পাথর" ১৯৮১ সালে, এবং সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ "খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর" ১৯৮৬ সালে। দীর্ঘ সাতাত্তর বছরের জীবনে মাত্র সাতটি কাব্যগ্রন্থ কবির সংযমী প্রচারবিমুখতার দিকে ইঙ্গিত করে, অথবা বলা যায়, নিতান্ত সক্ষম লেখা না হলে কবি তাদের জন্যে প্রকাশের দরজা খুলে দিতে রাজি নন। মোট ৩৬৩টি কবিতা গ্রন্থিত রয়েছে এই সাতটি কাব্যগ্রন্থে।

নবার্ক-প্রকাশিত অরুণ মিত্রের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত হয়েছে মোট ১০৭টি কবিতা। যেহেতু ১৯৮৫-তে প্রকাশিত সেহেতু স্বভাবতই এতে "খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর" অনুপস্থিত। সংকলনটিতে তখনো পর্যন্ত অগ্রন্থিত সাতটি কবিতা রয়েছে—তাই "খুঁজতে খুঁজতে বহুদূরে"র কবিতা একেবারে নেই বলা যায় না। অরুণ মিত্রের অনূদিত একশটি ফরাসি কবিতার একটিও সংকলিত হয় নি। সম্ভবত নির্বাচক-কবি বিরাম মুখোপাধ্যায় বরণীয় কবির মৌলিক কবিতার শ্রেষ্ঠ গুচ্ছ সাজাতে চেয়েছেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ভারবি থেকে ১৯৭২-এ প্রকাশিত অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতায় পেয়েছিলাম তাঁর অনূদিত আটটি ফরাসি কবিতাও। কবির কবিতায় ফ্রঁসিস পোঁজ, অঁরি মিশো, স্যাঁ-জন পের্স প্রমুখ ফরাসি কবির প্রভাব একেবারে নেই, একথা তাঁর নিষ্ঠাবান পাঠক মনে করবেন না।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রান্তরেখা"য় মোট কবিতা ছিল ৩৩টি। শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত হয়েছে ১১টি। আমার প্রিয় "বিড়ম্বনা" কবিতাটি নেই। এই কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলি প্রথাপ্রচল পথে রচিত, তবু কোনো-কোনোটিতে কবির বিশিষ্টতা গোপন থাকে নি। 'হৃদয়ের আন্দোলন ঘড়ির কাঁটায় যায় শোনা' এবং পরেই 'অবিশ্রাম উন্মাদনা বিস্ফোরণ আসুক নিকটে' ইত্যাদি পঙক্তি পাঠের মধ্যেই বুঝতে পারা যায় বৈয়াকরণিক 'শৃঙ্খলার সমারোহ' কবিকে বেঁধে রাখতে পারবে না। তাই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "উৎসের দিকে" আমরা পেয়ে গেলাম টানাগদ্যে লেখা কিছু কবিতার সঙ্গে "অমরতার কথা"ও —এই কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু "আধুনিক বাংলা কবিতা"য় গ্রহণ করলেন সাগ্রহে। প্রসঙ্গত, সেই সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুরও টানা গদ্যে লেখা কবিতা ছিল। "ঘনিষ্ঠ তাপে" অরুণ মিত্র প্রবহমান গদ্যে অনেক বেশি কবিতা লিখেছেন; পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতেও কবি নির্বাসিত ছন্দের পূজারী। ছন্দ ও মিলের কাছ থেকে দূরে যেতে চেয়ে কবি স্বীকারোক্তি করেছেন চমৎকার: 'কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারেবারে তাদের [ছন্দ ও মিলের] কাছ থেকে বাধা পেয়েছি বলেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।...মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনিবিন্যাসে করতে পারে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই সেই শব্দ সে ঘাড় ধরে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্য কবিতার বক্তব্য বিপথে চলে যেতে পারে'। অক্ষম কবির পক্ষে এরকম ব্যাপার ঘটতে পারেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্তত হয় নি, যদিও প্রথম দিককার তাঁর কিছু কবিতা আজ দ্বিশতাধিক বার পাঠের পরে কিছু দ্বিধা জন্মে দেয়। এই প্রাসঙ্গিক দ্বিমত সত্ত্বেও নিশ্চিত বলতে পারি, নির্বাসিত-ছন্দে প্রবহমান গদ্যে অরুণ মিত্র লিখলেও প্রতীকগর্ভ চিত্রকল্প, অর্থালংকার বাদ দিয়ে কবিতা লেখেন নি একটিও। শব্দের স্থমিত ব্যবহার, শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোত যে মাধুরী তার উন্মোচন, ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা গদ্য-গম্ভীর নয় আবার অসম্ভব স্নিগ্ধ কাব্যগন্ধীও নয়। আসলে তিনি এই দুইয়ের মাঝখানে নিজের আদলের আদর্শ হয়ে গেছেন। স্বগতোক্তিমূলক গদ্যলিরিক রচয়িতা হিসেবে অরুণ মিত্র বাংলা সাহিত্যে নিজের একটি স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছেন, তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন 'কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না / কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না / কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে / এক অনমনীয় পাথরে॥' এই 'পাথর' কি তবে তাঁর প্রবহমান গদ্যের কবিতা?

অনেককে বলতে শুনেছি, অরুণ মিত্র সজ্ঞান অলংকরণে বিশ্বাসী নন। তাঁর কবিতা নিতান্তই সহজ অন্তঃপ্রেরণার শ্রুতি। কিছু কবিতার পাঠ থেকে এমন ধরনের প্রত্যয় জন্মাতেই পারে। কিন্তু আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে তিনি আপাতনিরীহ শব্দকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করান। একের পর এক মহলের দরজা খুলে যেতে দেখি চোখের সামনে। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করা যাক এই প্রসঙ্গে: 'আমি এই হাত অন্ধের মতো মেলে / তাকে নিঃশব্দে বিদায় দিলাম।'... 'তবে কেন এই সান্ত্বনা / কেন এই কাগজের ফুল?'...'আমি রোজই দেখি / নষ্ট রাস্তায় কেউ একজন / পাগলের মত রাতের টুঁটি ধরবার চেষ্টা করে॥'...কিংবা 'পেছন থেকে ডাক শুনি / আমি বঁইচির ছায়া ছেড়ে / আরো স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করি,/পৃথিবীর শুরু আর শেষ / ঘুরে আসে উঠোনে,/ রোদ যায় চাঁদ উঠবে কখন? / আমি চেয়ে থাকি এক হাসি-মুখের দিকে।' এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তিনি প্রতিটি শব্দই পরিশ্রমী বিবেচনার পরে বসিয়েছেন। তাঁর নির্মাণকুশলতা হয়তো প্রথাসিদ্ধ কবিদের পেলব শব্দবিন্যাসের ঝোঁক এড়াতে চায়, কিন্তু অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য বহিরঙ্গেও কিছু লাবণ্য প্রত্যাশা করতেই পারে। প্রথম উদাহরণটির, অন্ধের মতো হাত মেলে দেওয়ার মধ্যে ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, হৃদয়ের আবেগ আর মমতা উদ্বেল হয়ে উঠছে নাকি? কিংবা 'সান্ত্বনা'কে 'কাগজের ফুলে'র সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে সেই একই বিষাদ-মমতা ফুটে উঠছে বলেই মনে হয় না! মূলত, অরুণ মিত্র নির্জনে শিল্পরচনায় বিশ্বাসী বলে 'আরো স্নিগ্ধতায় প্রবেশ' করতে চেয়েছেন। স্বয়ং কবি একটি সাক্ষাৎকারেও বলেছিলেন: 'না, যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য নয়, হৃদয় দিয়েই আমি বাঁচতে চাই।'

জনজীবন বরাবরই যাঁকে প্রভাবিত করেছে তাঁর পক্ষে সাধারণ মানুষের আনন্দবেদনার শরিক না হওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁর কবিতায় মন্ময় চৈতন্যের অনুসন্ধানী হয়েও অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনার লিপিকার। অরুণ মিত্র 'মানবিক সংবেদনার এলাকা' শনাক্ত করে চলেছেন তাঁর কাব্যকর্মে। সেদিনও এবং আজও।

সবশেষে, তাঁর একটি সম্পূর্ণ কবিতা তুলে দিতে চাই: 'তোমার মূর্তি আমি গড়ছি আদ্ধেক গড়ে আবার গুঁড়িয়ে আবার গড়ছি হাড়ভাঙা রাস্তার মাঝখানে তোমার মূর্তি আমি নগরবাসীরা দেখুক ঘামে পাথরে আমি কীভাবে আমার পরাজয়কে ছানি ভালোবাসাকে ছানি। হৈ হৈ করে সকাল আসে চুপিচুপি সন্ধে, এই ফাঁকটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে আবার হাত লাগাও আপিস কাছারি সদর অন্দর ঘেঁষে টগবগে ধুলোকাঁকর আমাকে ওঠায় নামায় আর হাতুড়ি ছেনি বাটালি দুপুরটাকে ঝনঝনিয়ে দেয় গড়ো ভাঙো গড়ো॥' অরুণ মিত্রের কবিতায় সাধারণভাবে দু-একটি পঙক্তির উজ্জ্বলতা কখনো-কখনো ঝলসে উঠলেও তিনি গোটা কবিতা লেখার পক্ষপাতী। উপরের কবিতাটি প্রথম পাঠের পর দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ বসেছিলাম। এমন নিটোল কবিতা খুব বেশি লেখা হয় না। অরুণ মিত্র এমনি কবিতা অনেক লিখেছেন।

তবুও এই কবিতার শেষ তিনটি শব্দ 'গড়ো ভাঙো গড়ো' ফিরে উচ্চারণ করে বলতে চাই—যে ছকে অরুণ মিত্র আমাদের চেনা হয়ে গেছেন তা কি তিনি আর ভাঙবেন না। মহৎ কবির কাছে প্রত্যাশা আমাদের সীমাহীন!

অপরূপ উকিল সত্যি অপরূপ প্রচ্ছদ এঁকেছেন।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মুঘল অর্থনীতির সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

The Economy of the Mughal Empire, c 1595: A Statistical Study. শিরীণ মুসভি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা xi+৪৪২। একশ পঁচানব্বই টাকা।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইতিহাস আলোচনার একটি নতুন ধারা। ১৯৬০-এর দশক থেকেই এই পরিমাণ-নির্ধারণ বা quantification-এর প্রবণতা ইতিহাসবিদদের মধ্যে বাড়তে শুরু করে এবং ক্রমশ তা আর্থনীতিক ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক এবং রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনাকেও প্রভাবিত করতে থাকে। অর্থনীতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে একদিকে সংখ্যাতত্ত্ব আর অন্যদিকে নবা ধ্রুপদী অর্থনীতির জটিল তত্ত্বের আলোকে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা শুরু হয়। অন্যদিকে সামাজিক এবং রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনাতেও সারণি আর সমীকরণের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নিয়ে মাতামাতিটা কিছু বেশি হয়েছিল—বিশেষত ১৯৭৪ সালে Robert Fogel ও Stanley Eugerman-এর Time on the Cross-এর অসাধারণ সাফল্যের পর। তবে এই নতুন ধারা ইউরোপীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও সমানভাবেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Journal of Economic History, ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত Annales: Economics, Societes, Civilisations এবং পশ্চিম জার্মানি থেকে প্রকাশিত Vierteljahrschrift fiur Sozial und Wirtschaftsgeschichte পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ওপর চোখ বোলালেই এই বিশেষ ধরনের ইতিহাস আলোচনার অগ্রগতি আমরা বুঝতে পারব। ভারতীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথম না হলেও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিরীণ মুসভির বর্তমান গ্রন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুসভি Fogel-এর কাছে পরিমাণ-ভিত্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণের পাঠ নিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে অবশ্য একটি কথা আগেই উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন। পরিমাণ-ভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে যখন খুব হৈচৈ চলছে, সেই ১৯৭১ সালেই একজন অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী ইতিহাসবিদ William Aydelotte একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মতে, পরিমাণনির্ধারণের পন্থা ইতিহাস বিশ্লেষণের অনেক পন্থার একটিমাত্র—এর সাহায্যে কিছু-কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সহজ হয়—সব সমস্যার সমাধান এর দ্বারা করা যায় না। অর্থাৎ পরিমাণগত বিশ্লেষণের ধারা গুণগত বিশ্লেষণের পরিপূরক মাত্র—দ্বিতীয়টিকে বাদ দিলে প্রথমটি অপূর্ণ থেকে যায়। মুসভির বই পড়তে-পড়তেও একই কথা মনে হবে। তাঁর অসাধারণ গবেষণার মূল্য স্বীকার করে নিয়েও বলতেই হয় যে, এমন কোনো নতুন প্রশ্ন তিনি তোলেন নি যা তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা উপেক্ষা করে গেছেন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগের সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি করেই তিনি এগিয়েছেন—সেগুলির সত্যাসত্য যাচাই করেছেন—এবং সেগুলির পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে জটিল অঙ্ক কষেছেন চারশ পৃষ্ঠা ধরে। এখানে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মধ্যে না গিয়ে শুধু ফলাফলগুলি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে মাত্র।

এই ফলাফলগুলির বেশিরভাগই আবার একটি বিশেষ সময়সীমায় আবদ্ধ, যা হল আনুমানিক ১৫৯৫ সাল, অর্থাৎ আকবরের শাসনকালের চল্লিশতম বছর। এর ফলে মুঘল অর্থনীতির আরোহণ-অবরোহণের চেহারাটা মুসভির আলোচনাথেকে আমাদেরনজরে আসে না। তবে এর কারণটিও সহজেই অনুমেয়। মুঘল অর্থনীতির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য যে তথ্যের প্রয়োজন তা মোটেই সহজলভ্যনয়, এবং তার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য আকর হল আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'। ইরফান হবিবের মতন মুসভিও বিশ্বাস করেন যে, এই গ্রন্থের পরিসংখ্যানগুলির অধিকাংশেরই সময়সীমা হল ১৫৯৫-৬ সাল। অন্যান্য সমসাময়িক ফারসি আর ইউরোপীয় সূত্র প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করলেও, 'আইন'-এর তথ্যই মুসভির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি, এবং তার ফলেই তা একটি ছোট্ট সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থেকেছে। আবার এক বিশেষ ধরনের তথ্যের ওপর নির্ভরশীল বলেই কিছু-কিছু বিষয়গত এবং অঞ্চলগত সীমাবদ্ধতাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ যেসব বিষয় আর অঞ্চলের ওপর তথ্য পাওয়া যায়, মুঘল অর্থনীতির পরিমাণনির্ধারণ তার বাইরে বেরোতে পারে নি। আর যেখানে তথ্য অপ্রতুল, হিসেব সেখানে অনুমাননির্ভর আর ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এই সীমারেখাগুলি অতিক্রম করা সহজ নয়, এ কথা মনে রেখেই বলা প্রয়োজন, মুসভির প্রয়াস মুঘল অর্থনীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অনেকখানি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট করে।

মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি, কাজেই অত্যন্ত সংগত কারণেই মুসভির আলোচনার প্রথম এবং প্রধান উপপাদ্য বিষয় হল কৃষি-অর্থনীতি। কৃষির বিস্তার প্রসঙ্গে 'আইন'-এর অন্তর্গত 'বারটি সুবার বিবরণ'-এর 'অরাজী' বা এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যানের নিরিখে মুসভি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, ১৫৯৫ সালে উত্তর প্রদেশে মোট ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ১৯০৯-১০ সালের পরিমাণের অর্ধেকের কিছু বেশি। এই পরিমাপ হবিবের পূর্ব-সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে। গুজরাতে এই পরিমাণ কিছুটা বেশি ছিল—প্রায় ৫৭ শতাংশের মতন। অন্যদিকে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরস্থ দিল্লী সুবায় এই পরিমাণ ছিল ৪৪ শতাংশ। দোয়াব অঞ্চলে কৃষির বিস্তৃতিতে বেশ কিছু বৈচিত্র্য ছিল। তবে মোট হিসাবে ১৯০৯-১০ সালের তুলনায় ১৫৯৫ সালে দোয়াবের মোট ফসলি জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৯·১৯ শতাংশ। দক্ষিণ পানজাবে এই পরিমাণ ছিল আরও কম, মাত্র ২৫ শতাংশের মতন। তবে এই অঞ্চলগুলিকে বাদ দিলে, আকবরের সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে 'আইন'-এ কোনো তথ্য না থাকায় ওই-সমস্ত প্রদেশে, বিশেষত বাঙলা, বিহার ও আজমীর সুবায় কৃষির বিস্তৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। মুসভির অনুমান, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিককার অবস্থার সঙ্গে তুলনায় ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিপর্বে মুঘল সাম্রাজ্যে মোট ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ। তবে এইসব জমিতে যেসব ফসলের চাষ হত তার সম্বন্ধে কিন্তু বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, একমাত্র আগ্রা-দিল্লী এলাকা ছাড়া। মুসভির হিসেবে, এই এলাকায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫৪০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে বিশেষ কিছু বাড়ে নি। বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে তুলো এবং আখের উৎপাদন বাড়লেও দাম এবং তুলনামূলক হিসেবে চাষের এলাকা কমেছে। নীল চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না, উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে। সামগ্রিকভাবে দেখলে এই অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদন মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই ছিল প্রায় আড়াইশ বছর ধরে, বরং অল্প কিছু কমে থাকতে পারে। সাম্রাজ্যের এই কেন্দ্রভূমির বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও প্রায় একই অবস্থা বর্তমান ছিল বলেই মুসভির অনুমান।

এখন প্রশ্ন হল, এই কৃষি উৎপাদনের কত অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্র সংগ্রহ করত। মোরল্যানড এবং হবিব মনে করেছিলেন 'জাব্‌তী' এলাকায় সাধারণভাবে উৎপাদনের একের-তিন অংশ রাজস্ব হিসেবে দাবি করা হত, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ছিল আরও কিছু বেশি। মুসভি এই মত মানেন না। তাঁর হিসেব অনুযায়ী আগ্রা অঞ্চলে তো বটেই, এমনকি তার বাইরেও সাধারণ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব হিসেবে দাবি করা হত উৎপাদনের অর্ধেক। আখ, নীল প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে দাবি করা হত ঠিকই, তবে তপন রায়চৌধুরীর মতন মুসভিও মনে করেন যে, কার্যক্ষেত্রে চাষিদের উৎসাহ দেবার জন্য কিছু-কিছু ছাড় দেওয়া হত। তবে সামগ্রিকভাবে কৃষকদের ওপর ভূমি-রাজস্বের চাপ বেশ বেশিই ছিল। কারণ, হবিবের মত খণ্ডন করে মুসভি দেখিয়েছেন, 'জমা'-র ৯০ শতাংশ ভূমি-রাজস্ব হলেও মুঘল যুগে 'জমা' বলতে বোঝাত কোনো অঞ্চল থেকে "নীট আয়ের" পরিমাণ, "ধার্য রাজস্বের পরিমাণ" নয়। অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে সর্বমোট আদায়ের পরিমাণ ছিল 'জমা'র তুলনায় বেশি। মুসভির হিসেবে, এই বাড়তি আদায়ের পরিমাণ ছিল 'জমা'-র প্রায় ৪৩ শতাংশ, যার মধ্যে ছিল জমিদারদের অংশ, স্থানীয় আমলাদের ভাগ এবং সংগ্রহের খরচ।

এই রাজস্ব-দাবির ক্ষেত্রে অবশ্য আঞ্চলিক তারতম্য ছিল প্রচুর, আর এই তারতম্য রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। যেমন উত্তর প্রদেশ আর হরিয়ানার কিছু অংশে ভূমি-রাজস্বদাবির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংগ্রহ করা যেত না। হরিয়ানার অন্যান্য অঞ্চলে এবং পূর্ব ও মধ্য পানজাবে এই সংগ্রহের পরিমাণ ছিল উত্তর প্রদেশের তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি, আর গুজরাতে ছিল ৪০ শতাংশ বেশি। তবে উত্তর প্রদেশে সংগ্রহের পরিমাণ কম ছিল মানে এই নয় যে কৃষকদের ওপর চাপ কম পড়ত। মুসভির মতে, এর প্রধান কারণ হল মুঘল রাষ্ট্র এই অঞ্চলে জমিদারদের বাড়তি দাবি মেনে নিত, ফলে রাষ্ট্রের ভাগে কিছুটা কম পড়ত। এই 'জাব্‌তী' এলাকার বাইরে, অর্থাৎ বাঙলা, বিহার, খান্দেশ, বেরার, আজমীরের কিছু অংশ এবং মালওয়া, যেখানে আকবরের শাসনকালে জরিপের কাজ বিশেষ এগোয় নি, সেখানকার ভূমি-রাজস্ব দাবি ও আদায়ের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ করা যায় না তথ্যের অভাবে। তবে কিছু-কিছু আঞ্চলিক তারতম্যের সম্ভাবনা বাদ দিলে কৃষকের ওপর চাপ সর্বত্রই প্রায় সমান ছিল বলে মুসভির ধারণা। অবশ্য তিনি এ কথাও স্বীকার করেন যে নগদে রাজস্ব সংগৃহীত হত বলে স্থানীয় বাজারে দামের হেরফেরের দরুন রাজস্বের দাবির পরিমাণে বেশ কিছু তারতম্য ঘটার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ইরফান হবিব দেখিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য একটি সমঝোতার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংস্থান কৃষকের হাতে রেখে বাড়তি উৎপাদন যতটা সম্ভব সংগ্রহ করা হত। সপ্তদশ শতকের শেষে গিয়ে এই সমঝোতা ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রের দাবি চাষির গ্রাসাচ্ছাদনে হাত দেয় এবং তার ফলেই কৃষকবিদ্রোহ। মুসভির লেখা পড়ে দেখি, আকবরের আমলেই উদ্বৃত্ত হিসেবে রাষ্ট্র সংগ্রহ করত মোট কৃষি-উৎপাদনের ৫৬·৭ শতাংশ। এটা বাদ দিয়ে কৃষকের হাতে যে ৪৩·৩ শতাংশ ফসল পড়ে থাকত তার ওপরেও ছিল জমিদার আর স্থানীয় আমলাদের দাবি। কাজেই প্রশ্ন জাগে, হবিব-বর্ণিত এই সমঝোতা কি ষোড়শ শতাব্দীতেই বজায় ছিল? না থাকলে কৃষকেরা এই চাপ একশ বছর ধরে কিভাবে সহ্য করে গেল? আর তাহলে আঠারো শতকের বাড়তি শোষণের ফলে কৃষকদের তো প্রায় একেবারেই অভুক্ত থাকার কথা! অভুক্ত কৃষকদের পক্ষে পরাক্রান্ত মুঘল বা হনীর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব ছিল কি? না কি মুসভি গোটা ব্যাপারটাকেই একটু বাড়িয়ে দেখছেন? প্রশ্নটা জাগে, কারণ অন্য দিকে তিনি দেখাচ্ছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর দক্ষ ও অদক্ষ শহরে শ্রমিকেরা তাদের উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরিদের চেয়ে অনেক বেশি সচ্ছল ছিল—যদিও তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে গ্রামীণ কৃষিজীবী শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানও উনিশ শতকের তুলনায় উঁচু ছিল। তবে কৃষিপণ্যের আপেক্ষিক দাম বেশি ছিল বলে ষোড়শ শতকের কৃষকের হাতে তুলনামূলকভাবে কিছু বেশি অর্থ জমা হত বলে ধরে নিলে সম্ভবত ভুল হবে না—কারণ রাজস্বের হার তো ক্রমাগতই বেড়েছে। এই অনুমানটি আরও জোরদার হয় মুসভির আরেকটি সিদ্ধান্তে। কিংসলি ডেভিসের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি দেখিয়েছেন, সপ্তদশ শতকে মুঘল ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছিল বছরে ০·২১ শতাংশ হারে। প্রাক্‌-শিল্পায়ন যুগের অর্থনীতিতে এই বৃদ্ধির হার যথেষ্ট গতিশীলতার ইঙ্গিত বহন করে—যার অর্থ হল সেই সময়ে কিছুটা সঞ্চয়ের সুযোগ এবং খাদ্যের নিয়মিত ও সুলভ যোগান ছিল। অর্থাৎ মুঘল আমলের কৃষকের হাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান তো বটেই, তার ওপর বাড়তিও কিছু নিশ্চয়ই থাকত—অন্তত ষোড়শ-সপ্তদশ

শতাব্দীতে তো বটেই।

তবে মুঘল যুগে যে বিপুলপরিমাণ কৃষিজ উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ করা হত এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো উপায় নেই। মুসভি আকবরের আমলে এই উদ্‌বৃত্ত ভাগ-বাঁটোয়ারার একটি হিসেবও দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যের মোট 'জমা'-র একটি ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ ৩·৪ শতাংশের মতন যেত ব্যক্তিগত 'সুয়ুরগাল' অনুদান প্রাপকদের ভাগে। সম্রাট ও রাজপরিবারের জন্য খরচ হত ১৩·৭৯ শতাংশ, আর রাজকোষে সঞ্চিত হত ৪·৭৩ শতাংশের মতন। জমিদারদের ভাগে যেত ২০ শতাংশ। এই হার বেশি হত মুঘল শাসন যেখানে দুর্বল ছিল। তবে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতেও কিছু-কিছু অংশে এই হার বেশ বেশিই ছিল, যা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী একটি জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। তবে এই উদ্‌বৃত্তের সিংহভাগ যেত মনসবদারদের কাছে। মোরল্যানড দেখিয়েছিলেন, আকবরই প্রথম মনসবদারিপ্রথা চালু করে মুঘল রাজকর্মচারীদের সুসংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের একাদশ বছরে (১৫৬৬-৭) মনসবদারদের জন্য 'জাত্‌' এবং 'সওয়ার' এই দ্বৈত পদ ধার্য করা শুরু হল এবং তাদের বেতনও স্থির হত এই দুই পদের ভিত্তিতে। কিছুদিন আগে এ. জে. কাইজার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে এই দ্বৈতপদবিশিষ্ট মনসবদারিপ্রথা চালু হয় আকবরের শাসনকালের অষ্টাদশ বছরে অর্থাৎ ১৫৭৩-৪ সালে। মুসভি দাবি করেছেন, ১৫৯৫-৬ সাল অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালের চল্লিশতম বছরের আগে এই দ্বৈত পদের অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়। আর ওই বছরে মনসবদারদের ওই দুটি পদের জন্য ধার্য বেতন খাতে খরচ হয় সাম্রাজ্যের মোট 'জমা'-র ৮১·৭৬ শতাংশ। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রায় ৮২ শতাংশ রাজস্ব-আয়ের ভাগীদার ছিলেন মাত্র ১,৬৭১ জন ব্যক্তি। আবার এদের মধ্যেও আয়ের ফারাক ছিল প্রচুর। ওপরতলার মাত্র ১২২ জন মনসবদারের বেতন দিতেই খরচ হত রাজস্ব-আয়ের ৫১·৮৮ শতাংশ। আর একেবারে নীচের তলার ১,১৮৪ জন মনসবদারের ভাগে পড়ত মাত্র ১৬ শতাংশ। মুসভির হিসেবের সঙ্গে কাইজারের দেওয়া ১৬৪৭ সালের হিসেবের তুলনা করলে দেখতে পাব যে, সম্পত্তির এই কেন্দ্রীকরণের মাত্রা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে সামান্য কমেছিল মাত্র, তবে এই কমার প্রধান কারণ ছিল মনসবদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি—কোনো ব্যবস্থাগত পরিবর্তন নয়।

কিন্তু এই বিপুলপরিমাণ উদ্বৃত্ত কি পুনর্বিনিয়োগে গিয়ে অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম ছিল? ইরফান হবিব একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমটি হল, এই সম্পদের বেশির ভাগটাই খরচ হয়ে যেত অনুৎপাদক সেবামূলক কাজের পেছনে, অথবা সোজাসুজি ভোগের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হল, এই সম্পদ ব্যয় করা হত শিল্পজাত সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে উৎপাদনশীল শহরে কারিগরদের কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকা সম্ভব। মুসভির তথ্য হাবিবের প্রথম সম্ভাবনাটিকেই প্রমাণ করে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী 'জমা'-র ৪৫·৩৪ শতাংশ সরাসরি ভোগ করা হত; ১৭·২৮ শতাংশ ব্যয় হত সেবামূলক শ্রমের পেছনে; আর শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য খরচ হত মাত্র ৩৭·৩৮ শতাংশ। এবং এর দ্বারাও যে দেশীয় বাজারের খুব একটা সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই, কারণ সম্রাট এবং আমীর-ওমরাহদের মূল চাহিদা ছিল ছোটোখাটো মহার্ঘ বস্তুর। ফলে এর দ্বারা ব্যাপক শিল্পের প্রসার ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে এর ফলে যে নগরায়ন ঘটেছিল তা মানতেই হবে, কারণ ১৫৯৫-৬ সালে সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ছিল শহরবাসী।

মুসভির সংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনায় মুঘল অর্থনীতি সম্বন্ধে আরও অনেক আকর্ষণীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। ষোড়শ শতকের অন্তাপর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের মুদ্রাব্যবস্থা, মূল্যস্তর, মজুরির হার এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ নির্ধারণের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস এখানে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রয়াস অনুমাননির্ভর—সে কথা লেখিকা নিজেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই আয়াসসাধ্য গবেষণার গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে সর্বশেষে একটি কথা উল্লেখ করতেই হবে—এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, পেশাদার বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের জন্যই লেখা।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা সাহিত্য আর নারীর মুক্তি

বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান—বেগম জাহান আরা। মুক্তধারা ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১, বাংলাদেশ। পঁয়ত্রিশ টাকা।

নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী—রশীদ আল ফারুকী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পনেরো টাকা।

নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য—জ্ঞানেশ মৈত্র। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। বত্রিশ টাকা।

ভারত-উপমহাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল গত শতাব্দের কলকাতায়। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর-বেথুনের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্জে, মদনমোহন তর্কালংকারের নামও উচ্চার্য। মিস মেরি কুক প্রমুখ মিশনারি কর্মীরা নারীশিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ প্রতিপত্তিশালীদের কন্যারা ঘরে ইংরেজ মহিলার কাছে পড়তেন। কিন্তু গত শতকের প্রথম পাদে অধিকাংশ বাঙালি পিতা পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে যতখানি সচেতন আর উদার হয়েছিলেন, কন্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই রক্ষণশীলতা দেখিয়েছিলেন। জে টমাস, টি. এক দিরদিন সেকথা তাঁদের কেতাবে লিখেছিলেন। মিস মেরি কুক-পরিচালিত 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যানড ইটস ভিশিনিটি' (২৫ মার্চ ১৮২৪-এ স্থাপিত) নারীশিক্ষাপ্রসারে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। এসব কথা যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর Women's Education in Eastern India বইয়ে লিখে গিয়েছেন। ওই সময়কার বাংলা সাময়িকপত্র-সংবাদপত্রে নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যম আর বাধার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

এই পটভূমি মনে রেখে আমরা আলোচ্য বই তিনটি দেখতে পারি। কলকাতার হিন্দুসমাজে ১৮২৪ সালে নারীশিক্ষার পথে যেসব সামাজিক বাধা ছিল আজ আর তা নেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বঙ্গসমাজে সে বাধা এখনো অপসারিত হয় নি। বেগম জাহান আরা মুখবন্ধে লিখেছেন—'বিশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এই বাঙলা দেশেরই কোন লেখিকার সাহিত্যচর্চার বাসনা যদি সংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশের জন্য পিষ্ট হয় তাহলে দুঃখের অবধি থাকে না।' এই মুখবন্ধের তারিখ ৩০ জুন ১৯৮৬। কোনো এক লেখিকার সাহিত্যচর্চায় পারিবারিক-সামাজিক বাধার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, পুরুষশাসিত এই সমাজে, এই উপমহাদেশে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গত একশ ষাট বছরে আমরা খুব-একটা অগ্রসর হতে পারি নি।

একথা মনে রাখলে আলোচ্য বই তিনটি অন্য এক মাত্রা পায়। এগুলি আমাদের কাছে সামাজিক দলিল রূপে প্রতিভাত হয়। বেগম জাহান আরার বইয়ের উৎসর্গপত্রে এই মনোভাবই প্রতিফলিত: মহিলাদের সাহিত্যচর্চাকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান সহায়ক-সোপান বলে যিনি মনে করতেন, লেখিকা তাঁকেই বইটি উৎসর্গ করেছেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে লেখিকাদের সাহিত্যচর্চার নিবিড় সম্পর্কের কথা মনে রেখেই আলোচ্য বই তিনটি লিখিত।

পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশের লেখিকাদের পরিচিতগ্রন্থ 'বাঙলাসাহিত্যে লেখিকাদের অবদান' খুব একটা গভীরে আলোচনা হয় নি। তবে হ্যানডবুক হিসাবে এটির উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য। লেখিকা যেভাবে মহিলা সাহিত্যিকদের পর্যায় ও পর্ব-বিন্যাস করেছেন তা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গিয়ে আমরা জানতে পারি, এখানে মুসলিম লেখিকাদের আবির্ভাব এবং অবদান আলোচিত হবে। আরো স্বীকৃতি পাই: কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করেই শুধুমাত্র ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে তিনটি পর্যায়ে লেখিকা আলোচনাকে বিভক্ত করেছেন—প্রাক-আধুনিক যুগ (১৮০০ সাল পর্যন্ত), আধুনিক যুগের প্রাক-পাকিস্তান যুগ (১৮০১-১৯৪৭ সাল), পাকিস্তান যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত (১৯৪৭-বর্তমান কাল) (পৃ ২)।

খুবই এলোমেলোভাবে কিছু-কিছু নাম উল্লিখিত হয়েছে। চর্যাগীতি-রচয়িতাদের মধ্যে কেউ-কেউ মহিলা বলে লেখিকার ধারণা। খুবই চমকপ্রদ ধারণা, কিন্তু তার সমর্থনে কোনো তথ্য নেই। ওই সঙ্গে সিদ্ধা ময়নামতীর গান নিয়ে এজাতীয় কিছু অনুমান আছে। চণ্ডীদাস-প্রেয়সী রামী রজকিনী পদ লিখেছিলেন বলে লেখিকার ধারণা। খুবই চমকপ্রদ ধারণা। লেখিকা দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য-ইতিহাস

থেকে কিছু মহিলাপদকর্তা আর রামায়ণ-রচয়িতা চন্দ্রাবতীর নামোল্লেখ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে অনুমানের পরিমাণ যতটা তথ্যের পরিমাণ ততটা নয়। বস্তুত চন্দ্রাবলী ছাড়া আর কোনো মহিলা-কবিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। গত শতকের শেষভাগের লেখিকা হিসাবে তিনি নাম করেছেন চার জনের—স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু। এঁরা তো হিন্দু। মুসলমান লেখিকা একজনের নামই করেছেন—নওয়াব ফয়জুন্নেসা, 'রূপজালাল' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস (১৮৭৬)

উনবিংশ শতাব্দে তো বটেই, বিংশ শতাব্দের সূচনায় মুসলমান সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। তার ইতিহাস লেখিকা কয়েক ছত্রে লিখেছেন (পৃ ১১), এটাই বিশদভাবে লেখা উচিত ছিল।

এরপরই লেখিকার গ্রন্থবিন্যাসের মূল পদ্ধতিটা ধরা যায়। মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন-সম্পাদিত 'সওগাত পত্রিকায় (১৯১-) যেসব লেখিকা লিখেছেন আজাদী-পর্যন্ত (১৯১৮-১৯৪৭) তাঁদের তালিকা দিয়েছেন সম্পাদক তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' গ্রন্থে। লেখিকা সেই তালিকাটি পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন। কে কী লিখেছেন, তা জানান নি, কে কী ধরনের লেখা (গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী স্মৃতিকথা) লিখেছেন, তারই তালিকা দিয়েছেন। আর সেই তালিকা ধরেই প্রধান-প্রধান লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

দীর্ঘকাল সচিত্র মাসিক সওগাত পত্রিকা (১৯২৯) সম্পাদনার পর মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন প্রকাশ করেন সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকা (জুলাই ১৯৪৭)। এই পত্রিকায় যেসব মুসলমান লেখিকা লিখেছিলেন তাঁদের লেখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা।

অতঃপর পাকিস্তান যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অধ্যায়ের সূচনায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় স্থানান্তরিত (১৯০০) বেগম পত্রিকায় বছরের পর বছর প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধ কবিতা-বিষয়ের উল্লেখ ও লেখিকাদের নামোল্লেখ। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত কয়েকটি মহিলা-পত্রিকার উল্লেখ পাই—মাহফুজা খাতুন-সম্পাদিত 'নওবাহার' (১৯৪৯), লায়লা সামাদ-পরিচালিত 'অনন্যা' (১৯৫২)। এবং পুনর্বার পরবর্তী চার দশকের লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এখানেই খতম্।

হয়তো এত কথা না লিখলেও চলত। কিন্তু লেখিকার হাতে তথ্যপুঞ্জের এই অপব্যবহারে দুঃখিত না হয়ে পারা যায় না। আফশোস, এই তথ্যপুঞ্জের সম্যক ব্যবহারে অন্তত গত ষাট বছরের মুসলিম-পরিচালিত বাঙলা সাহিত্যপত্র ও মুসলিম লেখিকাদের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আমরা পেতে পারতাম।

বেগম জাহান আরার মতে নওয়াব ফয়জুন্নেসাই প্রথম মুসলিম উপন্যাস-লেখিকা—তাঁর উপন্যাস 'রূপজালাল' (১৮৭৬)। এটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের মতে, নুরুন্নেছা খাতুনই প্রথম মুসলিম মহিলা ঔপন্যাসিক, তাঁর প্রথম সফল উপন্যাস 'স্বপ্নদ্রষ্টা' (১৯২৩)। বেগম জাহান আরার গ্রন্থে এ দুই অভিমত পেশ করা হয়েছে (পৃ ৯, ২৩)।

ডঃ রশীদ আল ফারুকীর নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ('৮৯৪-১৯৭৫)' ঢাকার বাংলা একাডেমীর জীবনী-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত সদ্যঃপ্রকাশিত পুস্তক। মাত্র ষাট পৃষ্ঠার মধ্যে পটভূমিকা, জীবনকথা, সাহিত্যকর্ম, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা—চারটি অধ্যায়ে লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে নূরন্নেছা খাতুনের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করেছেন। প্রাথমিক বক্তব্যে তিনিও এদেশে আধুনিক কালে নারীশিক্ষার সূচনা-ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দে হিন্দু সমাজে নারীশিক্ষার যে প্রসার সম্ভব হয়েছিল, মুসলিম সমাজে তা সম্ভব হয় নি। লেখক তার কারণ নির্দেশ করেছেন—ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। বিনয় ঘোষের ব্যবহৃত তথ্য অবলম্বনে তিনি দেখিয়েছেন, সেদিনের কলকাতা শহরের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে মিশনারি মেমদের প্রয়াসে নারীশিক্ষার প্রয়াস কিভাবে হয়েছিল। কুমিল্লার বিশিষ্ট সমাজসেবিকা নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীকে (১৮৩৪-১৯০৩) মুসলিম সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রথম পথিকৃৎ বলে লেখক মনে করেন। দ্বিতীয় নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান মহিলাদের কোনো দান আছে বলে লেখক মনে করেন না। প্রথম মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকারূপে 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'কে (১৯৩১), আর মহিলাদের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে 'ইসলাম প্রচারক' ও 'নবনূর'কে তিনি নির্দেশ করেছেন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে, তাঁর মতে, প্রথম লেখিকা বিবি তাহেরণ নেছা, তারপরে কুমিল্লার নওয়াব ফয়েজুন্নেসা (পৃ ১৫)। ডঃ ফারুকী ফয়েজুন্নেসার 'রূপজালাল' (১৮৭৬) রচনাটিকে একটি বৃহৎ গদ্য-পদ্য আখ্যায়িকা বলেছেন, কাব্য অভিধায় ভূষিত করেছেন (পৃ ১৫)।

বেগম জাহান আরা ও ডঃ রশীদ আল ফারুকীর মানসিকতা ও বিচারদৃষ্টির ভিন্নতা আমাদের কাছে প্রতিভাত

মুর্শিদাবাদের মেয়ে নূরন্নেছা খাতুনের বিবাহ হয়েছিল হুগলী-শ্রীরামপুরের আইনজীবী কাজী গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে। তিনি উদার প্রকৃতির ছিলেন, তাই নূরন্নেছা খাতুনের লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চায় বাধা পড়ে নি। নারীশিক্ষার পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল দ্বিধাহীন। নারীর শৃঙ্খলমুক্তিতে ছিল আগ্রহ। তিনি ছয়টি আখ্যানমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রধান হল দুটি উপন্যাস—'স্বপ্নদ্রষ্টা' (১৯২৩) আর 'আত্মদান' (১৯২৫)। লেখক অন্নের মধ্যে তাঁর লেখা গল্প উপন্যাস আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন।

ডঃ জ্ঞানেশ মৈত্রের "নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য" গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মুদ্রিত রূপ। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যতটা পুরুষের সৃষ্টি, ততটা নারীর নয়। তথাপি লেখিকাদের দান অবহেলার নয়, বরং বহুক্ষেত্রে নতুন কয়েকটি চেতনা তাঁরাই সঞ্চার করেছেন।

এটাই লেখকের মূল বক্তব্য। সারা বইতে তিনি এটাই প্রতিপাদন করেছেন। স্বীকার্য, এ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা গত অর্ধশতাব্দে হয়ে গেছে। খুব-একটা নতুন কথা বলা কঠিন।

লেখক প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অধিকার, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙলার নারী, ইসলামের অনুপ্রবেশ ও সমাজে তার প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ংবেঙ্গল, মিশনারি, বেথুন, সাময়িকপত্রাদি তথা নারীমুক্তির প্রশ্ন। এর সময়সীমা ১৮১৩-১৮৪৯। তৃতীয় অধ্যায়ের কালব্যাপ্তি ১৮৫০-১৮৭২। এ অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন কলকাতার হিন্দুসমাজে নারীসম্প্রদায়ের জাগরণে ঠাকুরপরিবার, বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মসমাজ, সাময়িকপত্রাদির ভূমিকা। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন গত শতকের শেষ পাদে (১৮৭২-১৮৯১) লেখিকাদের আবির্ভাব ও আত্মপ্রতিষ্ঠা—মুখ্যত গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারী কুসুমকুমারীর কাব্য ও উপন্যাসের আলোচনা। পঞ্চম অধ্যায়ে (১৮৯১-১৯২০ সময়সীমায়) কামিনী রায়, সরোজকুমারী, মানকুমারী, লজ্জাবতী, প্রমীলা, অনুপমা নিরুপমার কাব্য উপন্যাসের আলোচনা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১৯২০-১৯৪৯) শৈলবালা, শান্তা, সীতা, ইন্দিরা, প্রভাবতী, জ্যোতির্ময়ী, আশালতা দেবী, আশালতা সিংহ, রাধারানী, প্রতিভা বসু, বাণী রায়ের সাহিত্যকর্মের আলোচনা।

লেখকের সিংহাবলোকন ও পর্যালোচন প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু দুটি খামতি আছে। এক, সাহিত্য-আলোচনা গভীর নয়; দুই, গুরুত্ব অনুযায়ী লেখিকারা প্রাপ্য মনোযোগ পান নি। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর লেখিকাদের কাব্যপ্রয়াস ও কথাপ্রয়াসের অনেক বাপ্ত গভীর আলোচনা মুদ্রিত হয়েছে পূর্বেই। সেগুলি লেখক ভালো করে দেখে নিতে পারতেন। পঞ্চম অধ্যায়ে সাতজন লেখিকার জন্য বরাদ্দ চৌষট্টি পৃষ্ঠা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এগারোজন লেখিকার জন্য বরাদ্দ একত্রিশ পৃষ্ঠা। এর থেকেই অনুধাবন করা যায়, কার ভাগ্যে কী জুটেছে। কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন না লজ্জাবতী বসু ও প্রমীলা নাগ। প্রতিভা বসু, বাণী রায়, আশালতা সিংহ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর পাশে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী দাঁড়াতেই পারেন না। স্বর্ণকুমারী দেবীর কোনো রচনাই প্রথম শ্রেণীর নয়, তাঁকে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা দেওয়া যায় না,—এটা লেখক বোঝেন নি। অথচ কুসুমকুমারী দেবীর উপন্যাস অকিঞ্চিৎকর—তা অনুধাবন করেছেন (চতুর্থ অধ্যায়)। শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেখ আন্দু' উপন্যাসের উচিত প্রশংসায় তিনি কার্পণ্য করেন নি (পৃ ২৪২-২৪৫), অথচ অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে বর্ণহিন্দুর যে সংরক্ষণশীল মনোভাব ব্যক্ত তার সমালোচনায় তাঁর লেখনী কুণ্ঠিত। দু-একটি ভীরু মন্তব্য ছাড়া অনুরূপার উপন্যাসের তীব্র তীক্ষ্ণ শিল্পনিষ্ঠ সৎ মূল্যায়নে তিনি অগ্রসর হন নি।

আলোচ্য বই তিনটি আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে নারীরচিত সাহিত্যের সম্পর্ক কত নিবিড়।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রচার-অনীহ মুজতবা

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪) পরিণত বয়সে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, এবং তাঁর প্রথম গ্রন্থ "দেশে বিদেশে" (১৯৪৯) প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে পেয়েছেন অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। ষাটের দশকে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁর প্রস্তুতির পটভূমিও খুব হ্রস্ব নয়। সাহিত্য-রসধারার একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্য এবং প্রথম কৈশোর অতিবাহিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকেই কবি-গুরুর সান্নিধ্য তথা শান্তিনিকেতনের তৎকালীন পরিবেষ্টন তাঁকে রসের মহা-সমুদ্রসঙ্গমে অবগাহনের অবারিত সুযোগ এনে দেয়। পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত গ্রন্থপাঠ, 'হস্তমুদ্রিত' পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং পারিবারিক প্রতিবেশের আনুকূল্যে প্রথম কৈশোরেই মুজতবা আলীর জীবনের গতিধারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল—'আর কোনো দেবতার সেবা করার মত সুবুদ্ধি আমার হয়নি—প্রথম জীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন…।' [রায় পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩]

একই লেখনে বন্ধুর বেনামিতে মুজতবা স্বপ্রসঙ্গে বলেছেন :

নিতান্ত বালক যবে পুরাণের দেব-সভাস্থলে / চুপে চুপে দেখিয়াছি ইন্দ্র যম বরুণের গলে / মন্দারের মালা আর হস্তে নানা রতন সম্পদ—/বৈভব সৌন্দর্য কত। অপরূপ নর্ম লঘুপদ / উর্বশীর সম্মোহনী ইন্দ্রজাল নৃত্যচ্ছন্দময়/ শুনেছি সুরের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি আর জয় জয়। / লক্ষ্মীর বৈভব হেরি নিষ্কম্প তরুণ আঁখি মম, / মহেন্দ্র-অঙ্কলার পশ্চাতে ফিরিছে ছায়াসম। / হে পিথৌরা*, আজি আমি লজ্জা নাহি মানি, মুগ্ধ মোরে করেছিল সর্বাধিক শ্বেত বীণাপাণি। / কি মন্ত্রে সে ভানুমতী বালকের চিত্তাসনখানি জয় করে নিয়েছিল, মর্ম তার আজও নাহি জানি।

জীবিকার্জনের জন্যে মুজতবা আলী কখনো চাকুরি, কখনো লেখনী আশ্রয় করলেও শেষ পর্যন্ত কলমই হয়েছে তাঁর আহার-পানীয়ের যোগানদার, দিয়েছে বাসস্থানের আপাত নিশ্চয়তা। কলমই

সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য

যাঁদের রুজি-রোজগারের ভরসা, যশ-খ্যাতি আর প্রচার তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন। মুজতবা একাধিক রচনায় সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি লেখেন পেটের ভাতের জন্যে, টাকার জন্যে। সুতরাং প্রচারে তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশ্চর্যরকম অনাগ্রহী। গণপ্রিয় এই বাক্‌শিল্পী নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভের পরও নিজেকে একজন "বিশিষ্ট সাহিত্যিক" হিসেবে পরিচয়দানে অস্বস্তি বোধ করতেন, কুণ্ঠিত হতেন। লেখক হিসেবে অমরত্ব লাভের দাবিদার তো কখনোই ছিলেন না। এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় :

'…posterityর জন্য যারা লেখে তারা এ generation ও generation কাউকেই কিছু দিতে পারে না। আমার লক্ষ্য তো আরো সীমাবদ্ধ। আমি লিখি যারা 'পানি পিয়ে পিছে জাত বিচারে'—অর্থাৎ রসের বাজারে যারা ছুঁৎবাইগ্রস্ত নয়,—তাদের জন্য, এবং এই দু পাচ বছরের জন্য। কিছুটা সফল হয়েছি, কারণ unluckily for mother Bengali or luckily for myself এখন বাংলা সাহিত্যে আমার মত বাজে লেখকদেরই জয়-জয়কার। এক রাজশেখরবাবুকেই লেখক বলা যেতে পারে। গল্প না ওৎরালেও তাঁর সব সময়ই একটা standard থাকে। আর আমাদের হল তাক্‌-তুক্কার কারবার। (শ্রী অমলেন্দু সেনকে লেখা মুজতবা আলীর পত্র)

তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ আর বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্যে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধন-স্বীকৃতিতে নিস্পৃহতার কারণে আলী সাহেব কর্মজীবনে নিষ্ঠাবান হতে পারেন নি। উপরওয়ালাদের প্রতি তাঁর মন বিতৃষ্ণ থাকলেও অধস্তনরা আলী সাহেবের স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতি থেকে কখনো বঞ্চিত ছিলেন না। দোষেগুণে তিনি ছিলেন সাধারণের মনের মানুষ। ভক্তজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, আড্ডার রাজাধিরাজসুলভ মর্যাদা শেষাবধি তিনি লাভ করেছেন। বিশিষ্ট লেখক এবং মুজতবা-ভক্ত ইন্দ্রমিত্র তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার বাসনা প্রকাশ করায় প্রচার-বিমুখ আলী সাহেব 'মারমুখো হলেন। বললেন—'কখনো যদি আমার বিষয়ে একটি কথাও লেখো, আমি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারব।' অবশ্য ইন্দ্রমিত্র মুজতবা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন এবং কারণ নির্দেশ করেছেন—'হয়তো আলী সাহেবের পাথরের লোভেই এই লেখাটা শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারলাম। এমনিতে তো না খেয়ে কিংবা আমাশায় ভুগে মারা যাব, নরকস্থ হব, কিন্তু আলী সাহেবের হাতের পাথরে মরতে পারলে আমার স্বর্গলাভ অনিবার্য। আলী সাহেব কথার খেলাপ করবেন না, আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারুন, আমার আত্মা স্বর্গের দিকে চলে যাক, আমার লাশ অন্তত কিছুক্ষণ আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাক।' ("আরেক পঞ্চতন্ত্র," দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ. ১৮৯)

মুজতবা আলীর প্রচারবিমুখতার পরিচয় মেলে ইন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আলাপচারিতে। দেশবিদেশের কাহিনী, মনীষাপ্রসঙ্গ থেকে ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মুখর চিরতরুণ এই জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব 'একটি বিষয়ে …নিঃশব্দ—তাঁর নিজের বিষয়ে। প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যান। চুপ করে থাকেন। প্রশ্নাবলীর উত্তর আদায় করার চেষ্টা করেছি ; এবং সমূলে ব্যর্থ হয়েছি।' (ইন্দ্রমিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫)

মুজতবার ব্যক্তিজীবন-অন্বেষু বিফলমনোরথীদের মধ্যে খ্যাতিমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রথিতযশা সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মুজতবা আলী ১৯২১-এ শান্তিনিকেতনে কোথায় থাকতেন, কী পড়তেন ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আলী সাহেব যথারীতি 'সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তখন ওখানে (শান্তিনিকেতনে) যাঁরা ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা পাঠিয়েছেন। (পরিমল গোস্বামী, "পত্রস্মৃতি", ১ম প্রকাশ, পৃ. ২৪৫) সুতরাং সহজেই অনুমেয়, সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও দুই কৃতী অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণে কেন তিনি আত্মজীবনী রচনায় উৎসাহী হলেন না। তবে গুণগ্রাহীদের আগ্রহাতিশয্যে এবং মধ্যমাগ্রজের অনুরোধে 'আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টায়' একবার মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু জগতের আর-পাঁচটা অতি তুচ্ছ অপকর্মের ন্যায় এটিকেও তিনি অবহেলায় সূচনাতেই চিরতরে শ্মশানশয্যায় নিক্ষেপ করেন। 'ডায়েরি বুক' তাঁর ছিল, কিন্তু প্রচলিতার্থে 'রোজনামচা' রচনা করেন নি। তাতে পাওয়া যাচ্ছে নানা দেশের নানা ভাষার রচনামৃত, বিবিধ উদ্ধৃত, টুকরো খবর, স্বগতোক্তি এবং আরো বহু কিছু—যাকে ঠিক রোজনামচায় সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না। তবু এ-সমস্ত লেখায় মুজতবামানসের অন্তহীন জিজ্ঞাসার তথা তাঁর মানস প্রবণতার দিকটি সমুদ্ভাসিত।

১৯৬৯-এ আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে যশস্বী সাহিত্যিকদের জন্যে একটি অনুষ্ঠানমালা—'কি করে সাহিত্যিক হলাম'—সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, এবং মনোনীত সাহিত্যিকরা এই অনুষ্ঠানে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত হতে আলীসাহেবের ঘোরতর আপত্তি ছিল। গররাজীর হেতুটি সুযৌক্তিক কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে—কিন্তু তাতে কোনরকম ভণ্ডামি কিংবা প্রতারণার লেশমাত্র নেই। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত এর প্রায় এক যুগ পূর্বে ব্যক্ত করেছিলেন। সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় "আমার সাহিত্যজীবন" শীর্ষক 'কলমে' লেখার জন্যে বরেণ্য সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলে মুজতবা আলী অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর স্নেহসিক্ত সম্পাদককে লিখলেন :

'নিজের 'সাহিত্যজীবন' (বা অন্য কোনো জীবন) নিয়ে লেখার মত দম্ভ এখনো আমার হয় নি—……

………………………………………

'তার চেয়েও মারাত্মক, যদি কোনো হীনপ্রাণ লেখক…হঠাৎ বলে ওঠে রবিবাবু আমার গুরু—তখন রবিবাবুর কি অবস্থা হয়? যদি মনে করো…মত নির্ভেজাল dull লেখক যদি বলে উঠে 'পরশুরাম তার লেখার উপর 'প্রভাব' বিস্তার করেছেন সবচেয়ে বেশী তখন রাজশেখর বাবুর মনের অবস্থা কি হয়?…

'অতএব, বৎস, জেনে রেখো, এ-সব বাবদে লেখকরা সব সময় সাধু নয়। কার কাছে সত্যই ঋণী সেটা লুকোবার জন্য বাৎলে দেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির নাম—শুঁড়ী যে রকম পুলিশকে বাৎলে দেয় উল্টোপথ, যে পথে মাতাল আদপেই যায় নি।' [সাগরময় ঘোষকে লেখা পত্র]

শেষ পর্যন্ত আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্রের তৎকালীন প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ এবং আলী সাহেবের স্নেহধন্য শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তীর অনুরোধ-অভিমানে তাঁর মন কিছুটা কোমল হয় এবং নিজের সাহিত্য-জীবনের নেপথ্যকাহিনী বর্ণনা করেন বিশেষ একটি শর্তে—বেতারে প্রচারিতব্য তাঁর কথিকাটি যেন মুদ্রিত না হয়। এবং উল্লিখিত ভাষণটি এযাবৎ অমুদ্রিত ও অগ্রন্থিত।

'কি করে সাহিত্যিক হলাম' কথিকাটি ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯-এ আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে

*সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্যতম কলমী নাম 'রায় পিথৌরা'

প্রচারিত। মুজতবার আত্মপ্রচারবিমুখতাই লেখাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যিক-অনুভূতি অনুকূল পরিবেশ ও প্রেরণায় সৃজনশীল ব্যক্তির লেখনীতে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একমাত্র ইচ্ছাশক্তি কিংবা হুকুমের ওপর সাহিত্য তথা সার্থক কলা-সৃষ্টি নির্ভরশীল নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত পিয়েরে লোতি এবং আন্তন চেখফ। সাহিত্যক্ষেত্রে এঁদের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। আর মুজতবা আলী? সাফ কবুল করেছেন, একমাত্র 'অর্থকৃচ্ছ্রতা'-ই নাকি তাঁকে জোরজবরদস্তি সরস্বতীর আঙিনায় ঠেলে দিয়েছে। তাঁর দিনলিপির পাতায় '১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭'-এ লিখেছেন,—'জানি অভ্যাস নেই বলে লিখতে কষ্ট বোধ হয়। মানুষ সে কষ্ট নানা কারণে সয়ে নিয়ে বই লেখে। কেউ টাকার জন্য, কেউ আত্মম্ভরিতার তাড়নায়। আমার বেলা শুধু প্রথম কারণটা খাটে, অথচ টাকার জন্য লিখতে মন যায় না। মনে হয় তার চেয়ে অল্প মেহনতে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাওয়া যাবে।' [দিনলিপি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ ৩৬৬]

হাস্যরসে কথিকাটির সূচনা হলেও বিষণ্ণ বেদনায় এর পরিসমাপ্তি। আলী সাহেবের প্রথম গ্রন্থ "দেশে বিদেশে"-র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে তিনি মাদ্রাজ থেকে সিলেটে গিয়েছিলেন তাঁর স্নেহের পাত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রী জাহানারাকে কাহিনীটি নিজে পড়ে শোনাবেন বলে। কিন্তু দুর্ঘটনায় মেয়েটির অকালপ্রয়াণে মুজতবার মনস্কাম পূর্ণ হয় নি। প্রচারনিস্পৃহ সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যজীবনের নেপথ্য কাহিনী—'কি করে সাহিত্যিক হলাম'—আমরা হুবহু পরিবেশন করছি।*

'কোনো কিছু হওয়া না হওয়া কি আমার হাতে, না আপনার হাতে? এই তো সিদিনা আমার মেয়েটা কৌশলে পালিয়ে গিয়ে ভাব-ভালোবাসার বিয়ে করেছে। ফলে আমি বাবাজীবনের শ্বশুর হয়ে গেলুম। এটা কি আমার হাতে ছিল? কিংবা ধরুন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিয়েরে লোতির কথা। তিনি ছিলেন ফরাসি নৌবাহিনীর ছোকরা অফিসারদের অন্যতম এবং এঁরা যে তিনটি সাতিশয় হর্ষবর্ধক সৎকর্ম নিয়ে সদাই মত্ত থাকতেন লোতিও সেগুলিকে বর্জন করার কোনো আত্যন্তিক কারণ খুঁজে পান নি। বস্তুত তিনি ছিলেন এসব কর্মে পয়লা-নম্বরি। সে-তিনটি কী? মদ্যপান, জুয়ো আর বন্দরে বন্দরে এক-একটি প্রিয়া, সম্ভব হলে একাধিক। ইন্দোচীনের সমুদ্রে তাঁর হল মারাত্মক ম্যালেরিয়া। সেরে ওঠার পর ডাক্তার বললে তাঁকে মাসখানেক সম্পূর্ণ রেস্ট নিতে হবে। No drinks, no woman, no ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সারা দিনমান কাটে কী প্রকারে? লোতি লিখতে আরম্ভ করলেন একখানা নভেল এবং আশ্চর্য, সেটি শেষও করলেন। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক বন্ধুকে প্যারিসে। লিখলেন, 'পছন্দ না হলে ছিঁড়ে ফেলে দিও।' বন্ধু বইখানা পড়ে বিস্ময়ে নির্বাক। বই ছাপা হল। তিনি রাতারাতি প্রখ্যাত ফরাসী লেখকদের মধ্যে সম্মানিত স্থান পেলেন। অথচ তিনি প্রচলিতার্থে ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি, বইটইও পড়তেন না। সাহিত্যিক হওয়ার তাঁর কোনো বাসনাই ছিল না।

'কিংবা নিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক রুশ দেশের আন্তন চেখফ। তিনি লেখক হলেন কী প্রকারে? গরিব পরিবার। একটা ছোট্ট ঘরে মা কচু-ঘেচুর সুপ রাঁধছেন। বাবা অর্থাভাবের চিন্তা করে গজর-গজর করছেন। ভাই-বোনেরা কিচির-মিচির করছে। আর মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র চেখফ তারই এক কোণে হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খসখস করে পাতার পর পাতা অতি সস্তা ফার্স্ লিখে যাচ্ছেন। তিনি ভালো করেই জানেন রসিকতাগুলো অত্যন্ত কাঁচা। এবং আরো ভালো করেই জানেন সাধারণ পাঠক এই মালই চায়। সম্পাদকসাহেব ভীষণ খুশি হয়ে ছাপালেন। লেখা শেষ হল, রান্না কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। চেখফ ছোটো ভাইকে বললেন, 'লেখাটা নিয়ে যা তো অমুক পত্রিকার আপিসে। দু'-পাঁচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু সসিজ, কাবাব নিয়ে আসিস। ঐ কচু-ঘেচু গেলবার সুবিধা হবে।' বিগলিতার্থে চেখফ তাঁর প্রথম তথাকথিত সাহিত্যসৃষ্টিকে—ভাঁড়ামিকে যদি সাহিত্যপদবাচ্য বলা যায়—তিনি সেটি আরম্ভ করেন গণ্ডা দুই কাবাবের জন্যে। পরবর্তী যুগে চেখফ যখন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক হলেন, তখন তিনি আর মেডিকেল প্র্যাকটিস করতেন না। তবে রোজ সকালে গ্রামাঞ্চলের চাষাভুষোদের খয়রাতি চিকিৎসে করতেন। সেই সময় চেখফ একবার তাঁর এক বন্ধুকে বলেন, 'যখনই আমি ডাক্তারি প্র্যাকটিস না করে সাহিত্য রচনার জন্য কলম ধরি তখন আমি বড্ডই বিবেক-দংশনের জ্বালা অনুভব করি। আমার মনে হয়, আমি যেন আমার আইনত, ধর্মত বিবাহিতা স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে আমার রক্ষিতা রমণীর বাড়ি যাচ্ছি।' অর্থাৎ, সাহিত্যসৃষ্টিকর্ম ছিল তাঁর কাছে সাতিশয় আনন্দ-দায়িনী; কিন্তু তিনি এটাকে তাঁর জীবনের চরমাদর্শ বলে স্বীকার করেন নি। অথবা, দেখা যাচ্ছে বহু-বহু ক্ষেত্রে হবু লেখক তোড়জোর করে সাহিত্যিক হব বলে সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন না। যেমন মনে করুন, সংগীতের বেলা কিংবা চিত্রাঙ্কনের বেলা মানুষ ওই-ওই কলার সংগীত আকাডেমিতে বা আর্টস স্কুলে অধ্যয়ন সাধন করে আপন-আপন আদর্শ জীবনে সফল হতে চায়। সাহিত্যিক হবার জন্যে সেরকম কোনো আকাডেমি বা সাহিত্য-স্কুল তো নেই? কিন্তু ইতিমধ্যে, ভদ্রে, ভদ্র! আপনারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। আপনারা মনে-মনে বলচেন, "অত ধানাই-পানাই কেন বাওয়া? যারে ইংরিজিতে কয় 'beating about the bush?' আপন কথা কও। তুমি কী করে লেখক হলে? এদেশে সব্ব ধাপ্পাবাজিতে মানুষ হার মানার পর হয় বনে যায় পলিটিশিয়ান, নয় লেখক। তোমার বেলাও কি তাই?" এই তো ফেললেন মুশকিলে। বলি, 'জি'। কারণ, নাম্বার ওয়ান,—আমি আদৌ বিশ্বাস করি নে, আমি সার্থক লেখক। আমি ফার্স্ট ক্লাশ লেখক তো নই-ই, সেকেণ্ডও নই। মেরেকেটে ইন্টার ক্লাশ। সে-ও… [অস্পষ্ট]…কেটে। আর ইন্টার ক্লাশের ট্রাভেলারের বর্ণনা কে শুনতে চায় মশায়?

'দুই নম্বর: আমি মা গঙ্গায় কোমর অব্দি ডুবিয়ে, তাবা-তুলসী স্পর্শ করে, মাথায় কোরান শরীফ রেখে, যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করে তথা ক্রুশ-চিহ্ন ভক্তিসহ স্পর্শ করে বলছি, বৌদ্ধদের ত্রিশরণের দ্বিতীয় শরণ স্মরণ করে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' উচ্চারণ করে বলছি, ধর্ম জানেন আমি কক্খনো কস্মিনকালেও সজ্ঞানে অজ্ঞানে সাহিত্যিক হতে চাই নি।

'তিন নম্বর: আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সর্বসমক্ষে কোনো কিছু বলতে বড়োই লজ্জা বোধ করি। হয় সত্য গোপন করতে হয়, নয় ডাহা মিত্তো কতা কইতে হয়। খাঁটি কেন, এই ভেজাল যুগের ভেজাল সত্যি কথা বললেও আমার পাওনাদার আমার পিছনে লাগবেন। পুলিস পত্রপাঠ আমাকে গ্রেফতার করবেন। কাগজে কখনো আমার ছবি দেখেছেন? হুঁ:! হুঁ:! আমি অত কাঁচা নই বাওয়া!

'চার নম্বর: আমি কোনো প্রকারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গসাহিত্যাঙ্গনে পদক্ষেপ করিনি। আমার এমন কোনো বাণী নেই, এমন কোনো message নেই—যা না বললে এই সোনার বঙ্গভূমি কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি সেথায় নেমেছি স্রেফ মাত্র পেটের অন্নের জন্যে। আজ যদি আমি ডাবিতে বা চুরিচামারি করে লাখ পাঁচেক টাকা পেয়ে যাই, তবে অতি অবশ্যই, কলেমা খেয়ে বলছি—ভবিষ্যতে আর কলম ধরব না। তাতে আরেকটা সুবিধা, চেকও সই করতে হবে না। তবু যদি শুনতে চান, আমি কী করে লেখক হলুম? তবে নিবেদন, আমি তখন অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে* আমার এক অন্ধ্রদেশীয় বন্ধু বীরভদ্র রাও-এর সঙ্গে মাদ্রাজের বেলাভূমিতে নির্মিত তন্ত্র গৃহে কালযাপন করছি। সেখানে সমুদ্রের ওপারে চমৎকার সূর্যোদয় হয়। সূর্যাস্ত অবশ্য সমুদ্রগর্ভে হয় না। অর্থাৎ পূর্বাকাশে যে রঙে রঙে রঙিন চিত্রলেখা অঙ্কিত হয় সেটি কারো দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমি মাঝে-মাঝে তারই বর্ণনা আপন ডাইরিতে লিখি। বীরভদ্র রাওকে মাঝে-মধ্যে পড়ে শোনাই। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, সে একখানা অত্যুত্তম green leaf খাতা তথা ভারি সুন্দর একটি কলম এনে দিয়ে বললে, "সূর্যোদয় সূর্যাস্তের স্কেচ অর্থাৎ বর্ণনা তো এঁকেছো বিস্তর; এবার একটি পূর্ণাঙ্গ কেতাব লেখো।"

'তখন মনে পড়ল, আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান, আমার বড়োদাদার বড়ো মেয়ে জাহানারা একাধিকবার ব্যঙ্গ করে আমাকে বলেচে, 'হেঃ! ছোটো চাচার শুধু মুখে-মুখে হাই জামপ আর লঙ জামপ! একখানা বই লিখে দেখান না, আপনি কিছু একটা করতে পারেন?' আমার তখন বড্ডই গোশশাহত। তদুপরি অর্থকৃচ্ছ্রতা। তখন গত্যন্তর না পেয়ে লিখলুম "দেশে বিদেশে"। ওটা আপনাদের জানার কথা নয়, কারণ শুনলুম মাত্র দুই কপি বিক্রি হয়েছে। বীরভদ্র বললে, "ভালো হয়েছে।" সেইটি নিয়ে চললুম সুদূর মাদ্রাজ থেকে সিলেটে। বইখানা জাহানারাকে নিজেই পড়ে শোনাব বলে।

'ওই মেয়েটিকে আমি বড্ডই ভালোবাসতাম। গিয়ে দেখি জাহানারা সিলেটে নেই। তার স্বামী কক্স্বাজারে বদলি হয়েছে বলে দুই পুত্র ও তার পাতানো এক ভাই সহ সেখানে যাবার জন্য চাটগাঁ থেকে জাহাজ ধরেছে। দুদিন পরে খবর এল জাহাজডুবিতে সবাই গেছে।

'এই শোক আমার কলিজায় এখনো তাজা দগদগে ঘা হয়ে আছে। বইখানা তাই জিমতবাসিনী জাহানারার স্মরণে উৎসর্গিত হয়েছে॥'

নুরুর রহমান খান

* কোলকাতা বেতার-কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম এগজিকউটিভ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত 'টেপ' থেকে অনুলিখিত।

* হিসেবে গরমিল রয়েছে। আসলে হবে ১৯৪৬/৪৭

বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যপ্রসঙ্গ

অরুন্ধতী বন্দোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলাদেশের থিয়েটার—মুনতাসীর মামুন। স্বর্ণ : ঢাকা। পঁচিশ টাকা।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা—সম্পাদনা রামেন্দু মজুমদার। মুক্তধারা : ঢাকা। সত্তর টাকা, বাহান্ন টাকা।

বিষয় : নাটক—রামেন্দু মজুমদার। মুক্তধারা : ঢাকা। পঁয়ত্রিশ টাকা, পঁচিশ টাকা।

শিল্পসৃষ্টি আত্ম-আ বিষ্কারের নামান্তর। শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, একটি জাতির, একটি সমগ্র দেশের স্বাত্মপ্রসন্ধানের পথে শিল্পচর্চা অন্যতম পাথেয়। আর সে দেশ যদি ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কেই তার প্রধান পরিচয় বলে স্বীকৃতি দেয়, তবে তার সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নানা দিক থেকে অস্থিতীয়। ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরে অবিভক্ত বাঙলার সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে পূর্ব বাঙলার দান কিছু কম ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে ধর্মীয়, সামাজিক এবং আর্থ-রাজনৈতিক কারণে ওপার বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন অনেকাংশে ব্যাহত হয়ে পড়ে। অবদমন এবং অত্যাচারের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে তার জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতার সেই মহাক্ষণ থেকেই নতুন করে শুরু হয় তার নিজস্ব সংস্কৃতির রূপায়ণ—আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্রে যা এক নবজাত দেশের পক্ষে অনিবার্য পদক্ষেপ।

স্বাধীনতা পাবার পর গত ষোলো বছরে আর্থ-রাজনৈতিক জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ কিন্তু কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। বরং নানা প্রতিকূল পরিবেশে তা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে যে শিল্প-মাধ্যমটি উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ অর্জন করেছে, তা নাটক। বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাতেই একাধিক গোষ্ঠী আছেন যাঁরা নিয়মিত নাট্যচর্চা করে থাকেন। নাট্য-আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে সেখানে কিছুদিন আগে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সংগঠিত হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি নাট্য-প্রতিযোগিতা, নাটকসংক্রান্ত আলোচনা-সভা, নাট্যবিষয়ক পত্রিকা ইত্যাদি মিলিয়ে স্বাধীনতার পর পনেরো-ষোলো বছরে একটি বিশিষ্ট নাট্য-আবহাওয়া তৈরি করে তোলা হয়েছে।

ওপার বাঙলার নাট্যকর্মীদের এই সমান্তরাল নাট্য-প্রয়াস সম্বন্ধে ওপার বাঙলার নাট্যমোদীদের মধ্যে এক স্বাভাবিক কৌতূহলের উদ্রেক ঘটেছে। এই আগ্রহ আরও জোরালো করে তুলেছে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন উপলক্ষে কলকাতার মঞ্চে বাঙলাদেশের কয়েকটি প্রযোজনার উচ্চমানের মঞ্চায়ন ("নূরলদীনের সারাজীবন", "কীর্তন-খোলা", "এখনও ক্রীতদাস" বা "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়") কিন্তু ওপার বাঙলার কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এই কৌতূহল চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল না। ইদানীং বাংলাদেশের নাট্যইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নাট্যচর্চা বিষয়ক

নাটক

কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছে যার মাধ্যমে সে দেশের নাট্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। তেমনই তিনটি উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশনা নিয়ে বর্তমান আলোচনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা; প্রায় দুশো বছরের বাঙলা নাটকের ইতিহাস অনেকাংশে গড়ে উঠেছে কলকাতাকে ভিত্তি করে। এই নাট্য-ইতিহাস থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র নাট্য-ঐতিহ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন মুনতাসীর মামুন তাঁর "উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার"-এ।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ, সংবাদপত্রের টুকরো খবর, স্মৃতিকথা, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার পটভূমি হিসেবে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। উনবিংশ শতকের বাঙলার গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক

আচার অভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক স্তরভেদ, জনসংখ্যা, শাসনব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি নিয়েও তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে নাটকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা মনে রেখেই তৎকালীন বাঙলার সামগ্রিক জীবনযাপনের এই পরিপ্রেক্ষিতটি তিনি গড়ে তুলেছেন।

গত শতকের পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চাকে মুনতাসীর মামুন চারটি ধারায় ভাগ করেছেন। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র ছিল বাঙলার প্রধান শহরগুলি। এইসব শহরের ইংরেজ-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, যেগুলির অপর নাম ছিল "স্টেশন", বিদেশীদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। ব্রিটিশশাসিত পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চার প্রাচীনতম ধারাটির জন্ম দিয়েছিল এই স্টেশনগুলি। মূলত সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীদের বিনোদনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই থিয়েটার। ঢাকা নৌসেনার উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে পূর্ব-বঙ্গের প্রথম নাট্য-প্রযোজনা মঞ্চায়িত হয়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের একমাত্র ইংরাজি পত্রিকা "ঢাকা-নিউজ" থেকে এই প্রযোজনা সম্পর্কে কিছু কৌতূহলো-দ্দীপক তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

যেসব শহরে "স্টেশন-সংস্কৃতি" গড়ে উঠেছিল সেখানেই তৈরি হয়ে ছল একটি করে প্রেক্ষাগৃহ। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাবনা, সিলেট, চট্টগ্রামে অবস্থিত এই-জাতীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং নাট্যসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, অভিনয়ের সন-তারিখ, প্রযোজক-গোষ্ঠী বিষয়ক তথ্য ছাড়াও প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা, প্রযোজনার অনুষ্ঠানকাল, ব্যবহৃত সংগীত বাদ্য, প্রবেশমূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা অনুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এই আলোচনায়।

শাসক এবং শাসিতের অনিবার্য ব্যবধানের ফলে ইংরেজদের এই নাট্যচর্চা তাদের গণ্ডিবদ্ধ সমাজের সীমা ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গের জনজীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। লেখকের অনুমান, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলার মাটিতে বিদেশী নাট্যচর্চার এই ধারাটি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, উনবিংশ শতকে পশ্চিমবঙ্গেও ইংরেজ শাসকরা তাঁদের নিজেদের সমাজে নাট্যচর্চা করতেন। তবে তার অনেকটাই ছিল স্কুলে কলেজে সীমাবদ্ধ। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাটক-প্রযোজনা হত। ভ্রাম্যমাণ কিছু বিদেশী নাট্যদলও সে সময় স্থান থেকে স্থানে অভিনয় করে বেড়াতেন। শাসকগোষ্ঠীর এই নাট্যচর্চা নাটকরচনা বা প্রযোজনার রীতিকে প্রভাবিত করলেও এই বঙ্গের তা সাধারণ মানুষকে ছুঁতে পারে নি। এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজ না হলেও, এক বিদেশীর উদ্যোগেই কলকাতায় প্রথম বাঙলা নাটক মঞ্চায়িত হয়েছিল।

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চার আর-একটি প্রধান অঙ্গ শৌখিন থিয়েটার। থিয়েটারের মাধ্যমে অর্থোপার্জন নয়, সনিষ্ঠ শিল্পচর্চাও নয়, নিছক অবসরযাপন বা বিনো-দনের কারণে কিছু গোষ্ঠী এই সময় নাট্য-প্রযোজনা করতেন। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে এই-জাতীয় প্রয়াস সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই শতাব্দীর ষাটের দশকে ঢাকার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ "পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি" এই-জাতীয় উদ্যোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই দশকেই "নীলদর্পণ", "পদ্মাবতী", "আবু হোসেন" প্রভৃতি প্রযোজনা দেখার সুযোগ পান ঢাকার দর্শক। ১৮৬৯ সালে বরিশালে অভি-নীত হয় "স্বর্ণশৃঙ্খল" নামে একটি নাটক। বাঙলা নাটকের সমগ্র ইতিহাসে টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের নজির এই প্রথম। পশ্চিমবঙ্গে এই রীতি শুরু হয় ১৮৭২ সালে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরে। কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে, "স্বর্ণশৃঙ্খল"-এর প্রদর্শন অর্থের বিনিময়ে হলেও বস্তুত সেটি শৌখিন থিয়েটারের প্রযোজনাগুলির সমগোত্রীয় কারণ "অধিক গোল হইবে বলিয়া আহূত ব্যক্তিদিগের জন্য টিকেট করা হইয়াছিল।" (পৃ ২৮) ঢাকা ও অন্যান্য শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও এই ধরনের শখের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে নানা তথ্য সংকলিত করেছেন লেখক। মূলত সংবাদপত্র এবং সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে প্রযোজনাগুলির একটি কালানুক্রমিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু যথেষ্ট তথ্যের অভাবে এই আলোচনার সর্বত্র সমতা রক্ষা করা যায় নি। কতগুলি প্রযোজনা অনুপুঙ্খ সহকারে আলোচিত হলেও অন্যান্য কয়েকটির শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমবঙ্গে, মূলত কলকাতা শহরে, ধনী সংস্কৃতিমান ও নাট্যামোদী জমিদার এবং বাবুদের উদ্যোগে এই-জাতীয় শৌখিন নাট্যচর্চার প্রচলন ছিল। কিন্তু তা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে যাবার সুযোগ খুব একটা পায় নি। পূর্ববঙ্গে এই-জাতীয় নাট্যচর্চা সেদিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল।

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গীয় নাট্যচর্চার যে তৃতীয় বিভাজনটি মুনতাসীর মামুন করেছেন সে সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে। "আংশিক পেশাদারী", "কোনো বিশেষ আদর্শ বা তার প্রচার বা সুস্থ বিনোদনের কারণে সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের" (পৃ ৩১) উদ্যমপ্রসূত এই ধারাটিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন "গ্রুপ থিয়েটার" অভিধায়। কিন্তু "গ্রুপ থিয়েটার" নামে উভয় বাঙলাতেই সচরাচর যে আন্দোলনটি নির্দিষ্ট করা হয় সেটি বাঙলা নাট্য-ইতিহাসের একটি পর্বের ফসল। তার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলি একান্তই তার নিজস্ব। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম বাঙলায় স্বাধীনোত্তর যুগের এই নাট্য-আন্দোলনের "গ্রুপ থিয়েটার" নামকরণ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেক্ষেত্রে, বিংশ শতাব্দীর নাট্য-আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং শীর্ষনামে বিগত শতকের নাট্যচর্চাকে চিহ্নিত করা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যাই হোক, মুনতাসীর মামুনের মতানুযায়ী "সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম গড়ে তুলতে বাঙলাদেশ গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব" (পৃ ৩১) ঘটে ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করে। এই সূত্রে তিনি যে গোষ্ঠীগুলির বিবরণ দিয়েছেন সেগুলি চরিত্রগতভাবে গ্রুপ থিয়েটারের থেকে অনেক বেশি 'থিয়েটার ক্লাব'। আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হবে। ঢাকার "নবাবপুর এমেচিয়ার কোম্পানী" সম্বন্ধে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, 'নবাবপুরের বসাক পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই সংস্থা···যদিও এর নামের শেষে 'কোম্পানী' শব্দটি যুক্ত ছিল কিন্তু পেশাদারী সংস্থা ছিল না এটি।' (পৃ ৩২) এ প্রসঙ্গে সে সময়কার সংবাদপত্রের দু-একটি উদ্ধৃতিতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে—'নবাবপুরে সকের অভিনয় দ্বারা অনেককাল পূর্ব হইতে অনেকবার ঢাকাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে। এবারও (১৮৯৮) উত্তর নবাবপুরে সকের থিয়েটারে বুদ্ধদেব চরিত্রের অভিনয় হইতেছে।' (পৃ ৩৩) ঢাকারই আরেকটি "গ্রুপ থিয়েটার" "ইলিশিয়াম থিয়েটার" সম্পর্কে লেখকের উদ্ধৃত সংবাদ-অংশ 'ঢাকায় স্থানীয় রূপে আমোদ-আহ্লাদের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, কিন্তু···একটি নাট্যসমাজ গঠিত হইয়া সাধারণকে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে।' (পৃ ৩৩) ঢাকা ছাড়া অন্যত্র কিছু-কিছু এই-জাতীয় নাট্যগোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তবে এই আধা-শৌখিন, আধা-পেশাদারি নাট্যধারাটি ঢাকা শহরেই সবচেয়ে জোরদার ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিভিন্ন সময়ে প্রায় চার-পাঁচটি দল ঢাকায় বহু উল্লেখযোগ্য নাটকের ("নীলদর্পণ", "অভিজ্ঞান শকুন্তলা", "বিষমঙ্গল", "সীতার বনবাস") মঞ্চায়ন করেন। ঢাকা শহরে প্রথম মহিলা-প্রযোজিত নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত কিছু তথ্য লেখক এই সূত্রে পরিবেশন করেছেন। ১৮৮০ সনে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া করে টিকিট বিক্রি করে তিন বোনের উদ্যোগে "ইন্দ্রসভা" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সেই সময় থিয়েটারে সাধারণত মহিলা-চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। সেদিক থেকে এই মহিলা-পরিচালিত থিয়েটার নিশ্চয়ই বাঙলা নাট্য ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। বাঙলা নাটকের দল ছাড়াও উদ্ভূ নাটকের নিয়মিত প্রযোজক কিছু গোষ্ঠীর কথাও উল্লেখ করেছেন মামুন।

সম্পূর্ণ পেশাদারি থিয়েটার ঢাকায় শুরু হয় তথাকথিত "গ্রুপ থিয়েটার"-গুলির সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির সঙ্গে-সঙ্গে গড়ে উঠেছিল যে পূর্ববঙ্গ-নাট্যসমাজ তা প্রাথমিকভাবে শখের নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরে ক্রমশ পেশাদারি হয়ে ওঠে। গত শতকের সত্তর দশকের গোড়ায় এঁরা প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে নাটক মঞ্চস্থ করেন। লেখক এই প্রযোজনাকে সম্পূর্ণ পেশাদারি বলে উল্লেখ করলেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী পেশাদারি থিয়েটার সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক এবং সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মীদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র মাধ্যম। অথচ "পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ", তাঁরই পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে, কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং উক্ত প্রযোজনার টিকিটলব্ধ অর্থ সংকার্যে ব্যয়িত হয়েছিল। "পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ" ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেশিদিন চলতে পারে নি, একথাও লেখক স্বীকার করেছেন। পরস্পর-বিরোধী এমনই কতগুলি মন্তব্যে "পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ"-এর পেশাদারি চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। এই গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে তাই বাঙলা থিয়েটারের প্রথম পেশাদারি নাট্য-প্রয়াস হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা হয়।

সামগ্রিক বিবেচনায়, পূর্ব বাঙলার পেশাদারি নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল নব্বই-এর দশকে। এই দশকেই ঢাকা শহরে নির্মিত হয়েছিল দুটি সম্পূর্ণ পেশাদারি মঞ্চ। ১৮৮৭ সালে রানী ভিকটোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় "ডায়মণ্ড জুবিলি" থিয়েটার এবং পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ১৮৯০-৯২ সালে তৈরি হয় ক্রাউন থিয়েটার। এই দুই থিয়েটারে নাট্যপ্রযোজনাসংক্রান্ত বহু তথ্য উপস্থিত করেছেন লেখক। মঞ্চায়িত নাটকের তালিকা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম, এমনকি নিয়মিত অভিনয়ের নির্দিষ্ট দিন ও টিকিটের হার সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন উৎস থেকে। কলকাতার দলের আমন্ত্রিত অভিনয়ের বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন মামুন। কলকাতা থেকে আগত ন্যাশনাল, হিন্দু ন্যাশনাল এবং স্টার থিয়েটার গোষ্ঠী গত শতকের শেষভাগে ঢাকায় এবং পূর্ববঙ্গের অন্যত্র যেসব প্রযোজনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এই সূত্রে। উল্লেখ্য যে, কলকাতা মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ক্রাউন ও জুবিলী থিয়েটারের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য যুক্ত ছিলেন।

উপসংহারে গত শতাব্দীর পূর্ব এবং পশ্চিম-বঙ্গীয় নাট্যচর্চার একটি তুলনামূলক বিচার করার চেষ্টা করেছেন লেখক। একমাত্র সামাজিক প্রেক্ষিত ছাড়া, তেমন কোনো চরিত্রগত ও গুণগত প্রভেদ কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি এই আলোচনায়। নাট্যপ্রযোজনার উদ্দেশ্য মঞ্চ নির্মাণ বা প্রথম টিকিট বিক্রি করে নাট্যাভিনয় ছাড়া অন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে না গত শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় নাট্যচর্চা। নাট্যরচনা এবং প্রযোজনার সব ক্ষেত্রেই এই থিয়েটার বাঙলার অন্য সব অঞ্চলের থিয়েটারের মতোই কলকাতার অনুগামী ছিল। এই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার অবিভক্ত অস্তিত্বই ছিল সত্য। বাঙলার সংস্কৃতি বা নাট্যচর্চা বলতে স্বাভাবিকভাবেই অবিভক্ত বাঙলার নাট্যচর্চাই বোঝাত। সেখানে স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের তাগিদে বড়ো জোর পূর্ব বাঙলাকে ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে আলাদা করে দেখা যায়, কিন্তু তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টুকরো করা অসম্ভব। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য যে উনিশ শতকের "বাংলাদেশ"-এর নাট্যইতিহাস প্রণয়নের মধ্যে একজাতীয় কালানুক্রমণ আছে যা বিভ্রান্তির জন্ম দিতে বাধ্য।

গ্রন্থটির শেষে "সংকলন" অংশে মূলত "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা" ও "ঢাকা প্রকাশ" এই দুটি সংবাদপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াও সংগৃহীত হয়েছে। আলোচনা এবং তথ্যসংকলনে লেখকের নিষ্ঠা প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূলত প্রামাণ্য উৎসের অভাবে এ গ্রন্থ খানিকটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তবু মনে রাখতে হবে যে আলাদা করে পূর্ব বাঙলার নাট্যচর্চার ইতিহাস লেখার চেষ্টা এই প্রথম।

স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে "থিয়েটার" পত্রিকার একটি বিশিষ্ট দান আছে। ১৯৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা গত চোদ্দ বছর ধরে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের রূপ নির্ণয়ে জরুরি ভূমিকা পালন করেছে। এই এক যুগ ধরে "থিয়েটার"-এর পাতায়-পাতায় প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের নাটক এবং নাট্যবিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ, আলোচিত হয়েছে দেশের থিয়েটার আন্দোলনের নানা সমস্যা। সম্প্রতি পত্রিকাটির সম্পাদক রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় "থিয়েটার" পত্রিকার বিগত সংখ্যা-গুলি (১৯৭২-৮৬) থেকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যবিদের চব্বিশটি নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত, তাই পাঠক-গবেষকের পক্ষে আলোচনাগুলির প্রাসঙ্গিকতা রচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন।

সংকলনটিতে সাধারণভাবে নাটক এবং নাট্যসংক্রান্ত এমন কিছু আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে যেগুলিতে বাংলা-দেশের নাট্যচর্চার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ না থাকলেও বাংলাদেশী নাট্যচিন্তা, নাট্য-অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্য-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব মুনীর চৌধুরী পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের 'আধুনিক-তার স্বরূপ নির্ণয়ের একটি প্রয়াস করেছেন তাঁর "আধুনিক নাটক" প্রবন্ধে। ইবসেন থেকে শুরু করে বার্নার্ড শ হয়ে আয়নেস্কো, বেকেট, পিন্টার ও অ্যালবি নাটকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের সমকালীন নাটকের বিচার করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিকতার ধারণা প্রাচ্যে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা বা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের "আধুনিক নাট্যতত্ত্ব ও নাটক" ঠিক পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ নয়। সম্পাদকের নিবেদনে এটিকে একটি পরিকল্পিত প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল আজাদের চোখেও বাংলাদেশী নাটক

পাশ্চাত্য আধুনিক নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে ধরা পড়েছে। আধুনিক নাটকের 'অতি জটিল সৃজনশীল প্রক্রিয়ার', আলোচনায় লেখক গবেষণা, ইতিহাস, সমালোচনা ও তত্ত্বকে অত্যাবশ্যক উপকরণ হিসেবে দেখেছেন। শওকত ওসমান তাঁর "মঞ্চে অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে" প্রবন্ধে নাটক ও মঞ্চের সঙ্গে বাস্তব জীবন এবং সমাজের জটিল ও বহুস্তর সম্পর্কগুলি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। মঞ্চের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্প হিসেবে মানুষ ও সমাজের প্রতি নাটকের দায়িত্বকে তিনি সর্বাগ্রগণ্য বলে মনে করেছেন; বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ও ইতিহাসে নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নাট্যশিল্প শুধুমাত্র প্রযোজক, নির্দেশক বা অভিনেতার শিল্প নয়। এই মাধ্যমে দর্শকের একটি সক্রিয় সহভাগ প্রয়োজন। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ "নাটক দর্শক-দর্শিকা সমাচার"-এ নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে দর্শকের দান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনোত্তর নাট্যচর্চায় দর্শকের যথার্থ ভূমিকাটি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর এই নিবন্ধে। ঐতিহাসিক কারণেই স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চা রাজনৈতিক সচেতনতায় সমৃদ্ধ। রাজনীতি এবং নাটকের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপনির্দেশের প্রয়াস আছে আবু কায়েস মাহমুদের প্রবন্ধটিতে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে, তাঁদেরই প্রয়োজনে থিয়েটার আন্দোলন গড়ে তুললে তবেই তার যথার্থ বিকাশ ঘটতে পারে বলে মনে করেন লেখক। সেই আদর্শ থিয়েটারে জনগণের সহভাগ অপরিহার্য এবং কাম্য; সেই সঙ্গে প্রয়োজন এক সর্বজনীন স্বায়ত্ত শিল্পভাষা। লাতিন আমেরিকার কলমবিয়ার গণনাট্য আন্দোলনের আলোয় বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের গতিপথ নির্দিষ্ট করার প্রয়াস আছে এই প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, যে সাধারণ মানুষ বা জনগণ বলতে লেখক শুধু শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীকেই নয়, "উৎপীড়িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়"-কেও চিহ্নিত করেছেন। মার্কস এবং লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও লেখক শেষ পর্যন্ত শ্রেণীচরিত্র বা শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন তাঁর বিশ্লেষণে। বিভিন্ন সময়ে উভয় বাঙলার নাট্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মহম্মদ জাকারিয়া মঞ্চের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ সংযোগের ভিত্তিতে লিখেছেন "অভিনয়: বিভিন্ন মাধ্যমে"। যাত্রা থেকে শুরু করে নাটক, চলচ্চিত্র, বেতার এবং টেলিভিশনে অভিনয়ের পরস্পর সম্পর্কিত অথচ পৃথক অভিনয়রীতিগুলির তিনি একটি তুলনামূলক বিচার করেছেন। বাঙলায় অভিনয় সংক্রান্ত বিরল আলোচনাগুলির ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সংকলনের চব্বিশটি প্রবন্ধের মধ্যে দুটি প্রয়োগতত্ত্ব বিষয়ক। এরমধ্যে মহম্মদ জাকারিয়ার রচনাটি প্রথম, দ্বিতীয়টি ভাস্কর বন্দোপাধ্যায়ের "মঞ্চসজ্জার গোড়ার কথা"। প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জার জরুরি ভূমিকার ওপর লেখক আলোকপাত করেছেন। যে-কোনো নাট্য-প্রযোজনায় মঞ্চ-পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পর্যায়গুলি সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবুল মোমেনের "প্রলয়পথে দীপশিখা" রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটকের সাহিত্যিক মূল্যায়ন। এই প্রবন্ধটি ঠিক কী যুক্তিতে সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হল সেটা বোঝা দুষ্কর। হয়তো বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যবোদ্ধার চোখে রবীন্দ্রনাট্য কিভাবে ধরা দিয়েছে তারই একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এটি রাখা হয়েছে।

সংকলনের অন্য ষোলটি প্রবন্ধ বাংলাদেশের নাট্যচর্চা এবং নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধীয় আলোচনা। এপার বাঙলার মতো ওপার বাঙলাতেও মঞ্চোপযুক্ত নাটকের অভাব নাট্য-আন্দোলনের একটি প্রধান সমস্যা। ব্রিটিশ শাসক উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার পর এবং পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হবার পর থেকে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব দেখা গিয়েছিল ওপার বাঙলায়, অসীম সাহার নিবন্ধ "বাংলাদেশের নাটক: অন্তর্গত উপলব্ধি" তারই একটি পর্যালোচনা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পরও এই বন্ধ্যাত্ব সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে বলে লেখক মনে করেন না। কারণ নাট্যকার এবং নাটকের সংখ্যা বাড়লেও গুণগত দিক থেকে নাট্যসাহিত্য কতটা উন্নত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আঙ্গিকগত চমক এবং প্রয়োগনিপুণতার দিকে অধিকাংশ নাট্যকারদের যতটা ঝোঁক ততটা মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির দিকে নয়। সার্থক নাটক রচনার জন্য আন্তরিকতা এবং আবেগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত সমাজচেতনা এবং অনুশীলন। বাংলাদেশের নাট্যরচনা সংক্রান্ত আরো দুটি বিশ্লেষণনির্ভর প্রবন্ধ আবদুল হকের "সাহিত্য হিসেবে নাটক" এবং আলী আনোয়ারের "বাংলাদেশের নাটক: সমস্যা ও প্রবণতা"। নাটক যে শুধু "মঞ্চযোগ্য স্ক্রীপ্ট" নয়, তা যে সাহিত্যও বটে, বিশ্বের নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় তাই উপস্থাপিত করেছেন আবদুল হক। বাংলাদেশের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণের থেকে মঞ্চযোগ্যতাই অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে বলে মনে হয়েছে তাঁর। মুনীর চৌধুরী বা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের মতো কিছু বিরল নাট্যকার ছাড়া অন্যান্যদের সৃষ্টির মধ্যে যথার্থ সাহিত্যগুণের অভাব লেখকের চোখে পড়েছে। আলী আনোয়ারের প্রবন্ধটির পরিসর বিস্তৃত। সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নাটকের জন্ম থেকে আরম্ভ করে বাঙলা নাটকের বিবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাহত নাট্যরচনার ইতিহাস হয়ে তিনি স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশী নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় পৌঁছেছেন। সমকালীন বিভিন্ন নাট্যদৃষ্টির বিশ্লেষণের তিনি বাংলাদেশের নাটকের কয়েকটি অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ওপার বাঙলার সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্যে আবেগের তীব্রতা থাকলেও যথার্থ জীবনবোধের অভাব আছে, আঙ্গিকের চমক থাকলেও সংহত নির্মাণ নেই, পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণ আছে কিন্তু প্রকৃত উপলব্ধি নেই। আবদুল হকের চোখে বাংলাদেশী নাটকের যে সাধারণ খামতি ধরা পড়েছে আলী আনোয়ারের আলোচনায় তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত এবং বিশদীকৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চাবিষয়ক এই প্রবন্ধসংকলটি মুনীর চৌধুরীর উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর নিজের লিখিত প্রবন্ধ ছাড়া এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁর নাটকবিষয়ক দুটি রচনা: "মুনীর চৌধুরীর নাটক" এবং "কবর"। "কবর" মুনীর চৌধুরীর সর্বাধিকখ্যাত এবং প্রযোজিত নাটক। জেলের মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারির পুণ্য লগ্নে অভিনয় করার জন্য লেখা হয়েছিল এই নাটক। আনিসুজ্জামান তাঁর ছোট্ট নিবন্ধে এই নাটক লেখা এবং প্রযোজনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। "কবর"-এর নাট্য ঘটনা প্রায় কুড়ি বছর পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। এই নাটকের সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছে অনেক আবেগ, সংগ্রাম আর প্রতিবাদের কাহিনী। ১৯৪৩ সাল থেকে মুনীর চৌধুরী লিখতে শুরু করেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এই সম্ভাবনাময় নাট্যকার শহীদ হন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রবন্ধ মাঝের তিরিশ বছরের নিরলস নাট্যসাধনার একটি পর্যালোচনা। নাট্যজীবনের প্রথম দিকে বহু সচেতন রাজনৈতিক নাটক লিখলেও পরবর্তী কালে মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এই সময় তিনি মৌলিক নাট্যরচনা ছেড়ে অনুবাদকর্মে মনোযোগ দিয়েছিলেন, প্রতিবাদী নাটক ছেড়ে লিখেছিলেন কৌতুকধর্মী নাটক। অকালমৃত্যু না হলে তিনি বাংলাদেশের নাটককে নিশ্চয়ই আরও নানাভাবে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে শেক্স্‌পীয়রীয় নাটকের একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেক্স্‌পীয়রের নাট্যাদর্শের ঋণ স্বীকার করেছিলেন তাঁর "মালিনী" নাটকের ভূমিকায়। বাঙলা ভাষায় শেক্স্‌পীয়র কতটা জনপ্রিয় হয়েছেন এই বিচার করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কতগুলি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, স্কুলকলেজের বাইরে শেক্স্‌পীয়রের নাটক বাঙলায় কতটা অভিনীত হয়েছে, বাঙলা নাট্যরচনায় তাঁর প্রভাব কতখানি, শেক্স্‌পীয়র অনুবাদের হার এবং মান কী, এবং শেক্স্‌পীয়র-সমালোচনা বাঙলায় কতখানি হয়েছে। এই-সমস্ত জরুরি প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধটি শেক্স্‌পীয়র, তাঁর নাট্যরচনা এবং পরপ্রেক্ষিত নিয়ে যতটা আলোচনা করেছে সে তুলনায় বাঙলা ভাষায় শেক্স্‌পীয়র প্রতিগ্রহণের বিশ্লেষণ করেছে কম। তথ্য বা বিশ্লেষণের থেকে প্রবন্ধটিতে মতামত এবং সিদ্ধান্তই অধিক স্থান অধিকার করেছে।

সংকলনে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, সংশ্লিষ্ট সমস্যা, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ নিয়ে তিনটি মনোগ্রাহী রচনা সংগৃহীত হয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুন বাংলাদেশের একজন সক্রিয় নাট্যকর্মী এবং স্বনামধন্য-নাট্যকার। তাঁর "নাটক নাট্য আন্দোলন ও বিবিধ সমস্যা" প্রবন্ধে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সনিষ্ঠ নাট্য আন্দোলনের বাধা-বিপত্তি, রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যচর্চার অগ্রগতির চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে শাহরিয়ার কবিরের "নাট্য আন্দোলনের সমস্যা" বাংলাদেশের সমকালীন নাট্যচর্চার একটি ঐতিহাসিক, সমাজনৈতিক এবং আর্থ-রাজনৈতিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছে। পূর্ববঙ্গের ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তানি আমলের নাট্যপ্রয়াসের ইতিহাসের আলোচনা থেকে শুরু করে লেখক আধুনিক নাট্যচর্চার পর্যালোচনায় এসেছেন। শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পের মধ্যেও যে শ্রেণীচরিত্র

এবং শ্রেণীস্বার্থ কাজ করে সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে ব্যাপক অর্থে নাট্যআন্দোলন হিসেবে স্বীকার করে নিতে পারেন নি লেখক। ঢাকার চারটি-বিশিষ্ট দলের প্রযোজনার ধরন এবং নাটকনির্বাচনসংক্রান্ত বক্তব্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে কবির দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের থিয়েটার প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে নি। এবং যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন, কবিরের মতাদ্বয়ায়ী, বাংলাদেশের নাট্যপ্রচেষ্টা আন্দোলনের স্তরে পৌঁছতে পারবে না।

আল মুহম্মদ তার "নাট্য এবং কাঙ্ক্ষিত নাট্য-আন্দোলন" প্রবন্ধে নাট্য-আন্দোলনের মৌল সংজ্ঞাটি-নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যে শিল্প-আন্দোলন সমাজসচেতন এবং সমাজসংশ্লিষ্ট নয় তা লেখকের চোখে অন্তঃসারশূন্য এবং প্রাণহীন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সামাজিক আন্দোলনের অংশ এমন নাট্য আন্দোলনই লেখকের চোখে প্রগতিশীল। নাট্য-আন্দোলনের এই আদর্শ কাঙ্ক্ষিত রূপটির প্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের নাট্যচর্চার স্বভাব এবং অগ্রগতির আলোচনা করেছেন। নবীন নাট্যগোষ্ঠী ও কর্মীদের সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে ঠিক খাতে প্রবাহিত করার মধ্যেই নিহিত আছে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এই বিশ্বাসই তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

আলী সাহের রচিত "স্বাধীনতাযুদ্ধ ও আমাদের নাটক" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নাট্য-আন্দোলনের গভীর সংযোগের ইতিহাস উন্মোচিত করে। তবে এই রচনাটি মত আবেগ ও উচ্ছ্বাসনির্ভর ততটা বিশ্লেষণধর্মী নয়। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলির মধ্যে 'ড্রামা সার্কল' একটি সুপরিচিত নাম। পাকিস্তানি আমল থেকে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী তাঁদের একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। স্বাধীনোত্তর কালে এই দলের পুনর্জন্ম ঘটেছে। ওপার বাঙলার নাট্য-আন্দোলনে ড্রামা সার্কেলের দান এবং ওই গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ফজলুল কবিরের প্রায় একক প্রয়াসের সশ্রদ্ধ আলোচনা হোমায়েত হোসেন মোরশেদের নিবন্ধ "ড্রামা সার্কল : প্রসঙ্গকথা এবং একক ফজলুল করিম।"

বাংলাদেশের সামগ্রিক নাট্যচর্চার ইতিহাস নিয়ে লেখা তথ্যমূলক প্রবন্ধ মমতাজউদ্দিন আহমেদের "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত।" সাম্প্রতিক কালের নাট্য-প্রয়াসকে তিনি দেখেছেন অতীতের নাট্য-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। বাঙলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ যুগের নাট্যচর্চা; পাকিস্তানি আমলের বিভিন্ন পর্যায়ের নাট্যপ্রয়াস হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের নাট্যকর্মের সামগ্রিক প্রসঙ্গে পৌঁছেছেন তিনি। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সামগ্রিক ইতিহাসের একটি পর্যালোচনা করেছেন তিনি। যেটা আরও বড়ো কথা, নাটকের এবং নাট্য-প্রযোজনার সব ক্ষেত্রেই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংপৃক্ত করেছেন লেখক। তাঁর এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ আরও শক্ত ভিত খুঁজে পেয়েছে কয়েকটি বিস্তারিত তথ্যপঞ্জীর সাহায্যে। এই তথ্যপঞ্জী-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এক শতাব্দীর কিছু বিশিষ্ট ঘটনা", "সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনে রচিত নাটক", "বিদেশী নাটক নাটিকার রূপান্তর", "উপন্যাস ছোটগল্পের নাট্যরূপান্তর ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, রূপান্তর নাটকের তালিকায় মূল নাটকের উল্লেখ থাকলে ভালো হত। পাশাপাশি নাটদল, নাট্যকর্মী, নাট্যামোদী দর্শক এবং সাধারণ দর্শকের মতামতের সাহায্যে তিনি ওপার বাঙলার নাট্যচর্চার আরও কতগুলি জরুরি স্তর উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একদিক থেকে সংকলন-টির সবচেয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ এটি, কারণ এর সাহায্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাঠকের কাছেও সে দেশের নাট্য-ইতিহাসের অতীত, বর্তমান, এমনকি ভবিষ্যতের নিশানাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

কবীর চৌধুরীর "আমাদের নাট্যকর্ম : কাল ও আজ" এবং সম্পাদক রামেন্দু মজুমদারের "বাংলাদেশের নাটক ১৯৭২-৮৬" সমগোত্রীয় দুটি রচনা। ১৭৯৫-এ লেবেদেফের "কাল্পনিক সংবাদল" থেকে শুরু হয়েছিল বাঙলা নাটকের যে যাত্রা তাকে অনুসরণ করেছেন কবীর চৌধুরী উনিশ শতকের কলকাতা-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। পূর্ববঙ্গের সংযুক্ত নাট্য-ইতিহাসের আলোচনাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে। ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে প্রতিটি দশকের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার, নাট্যসৃষ্টি এবং প্রযোজনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে সমকালীন নাটকের বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়েছেন লেখক। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যকারদের প্রায় প্রতিটি আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটকই উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার মূল প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করেছেন লেখক—নাটকরচনা ও প্রযোজনা সম্পর্কে গতীয়ত মনন, মৌলিক নাট্যরচনার বৃদ্ধি, বিদেশী নাটক এবং নাট্যকারদের প্রভাব নাটকের গণায়ন ইত্যাদি। রামেন্দু মজুমদারের প্রবন্ধটি খানিকটা এই রচনার পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তবে দ্বিতীয় আলোচনাটি তথ্যনির্ভর হলেও ততটা বিশ্লেষণধর্মী নয়। এক্ষেত্রে পরিধিও সংকীর্ণ। শুধুমাত্র স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্য-প্রযোজক, নাটক ও প্রযোজনার সম্পর্কিত জরুরি অনুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সৈয়দ শামসুল হক প্রধানত কবি এবং সাহিত্যিক হলেও তাঁর সার্থক নাট্যসৃষ্টি "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" তাঁকে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর "নাটকের নিজের মুখ" কোনো লিখিত প্রবন্ধ নয়, "থিয়েটার" গোষ্ঠীর তিনশোতম অভিনয়ের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ। আলোচনাটির গুরুত্ব তার সৎ আত্মানুসন্ধানে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সঠিক অন্বেষণ তার স্বারূপ্য সন্ধান, কারণ জাতির, দেশের এবং সংস্কৃতির উৎস সন্ধানের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের নাটককে তাই হয়ে উঠতে হবে বাংলাদেশেরই মাটি, জল, হাওয়া, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকে লালিত স্বতন্ত্র নাটক, 'ইয়োরোপীয় নয়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গীয় নয়' (পৃ ১১৫)

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বহু তরুণ নাট্যকর্মী কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় নাট্য-জগতের কর্মতৎপরতা তখন তুঙ্গে। শোনা যায়, কলকাতার সেই জীবন্ত নাট্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশী নাট্য-কর্মীরা দেশে ফিরে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে একটি সচেতন নাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্তমান সংকলনের নানা প্রবন্ধে এই নাট্য-আন্দোলনকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক এপার বাঙলার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনই এই নামকরণের উৎস। অথচ পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতাপরবর্তী যুগের নবনাট্য আন্দো-লনের "গ্রুপ থিয়েটার" নামকরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন, বহু বিতর্ক আছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত "গ্রুপ থিয়েটার" আন্দোলনের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্র্য আছে যার সঙ্গে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের স্বতন্ত্র রূপটিকে এক করে দেওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধগুলির বিচার-বিশ্লেষণে দুটি মানদণ্ড বারবার কাজ করেছে—পাশ্চাত্য থিয়েটার এবং পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার। যে দেশ বা জাতি সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতার সন্ধান করছে তার পক্ষে এই ধরনের নির্ভরতা থেকে মুক্ত হওয়াই ভালো; সে দেশের নাট্যমানসে তাই "নাটকের নিজের মুখ" গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

এপার বাঙলার পাঠকের কাছে ওপার বাঙলার নাট্যচর্চার বহুমাত্রিক, বহুস্তর চিত্রটি সম্পূর্ণতা পায় রামেন্দু মজুমদার প্রণীত "বিষয় : নাটক" গ্রন্থটির মাধ্যমে। আলোচ্য তিনটি প্রকাশনার পেছনেই শ্রী মজুমদারের উৎসাহ এবং নিষ্ঠা কাজ করেছে। বাংলাদেশের থিয়েটারের সক্রিয় কর্মী ও "থিয়েটার" পত্রিকার নিষ্ঠাবান সম্পাদকের বাইরেও তিনি যে বাংলাদেশের নাট্য-ঐতিহ্যের নির্মাণে একজন উৎসাহী কারিগর, তা এই তিনটি গ্রন্থের গড়ে ওঠার ইতিহাস থ তথ্যে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায়।

গ্রন্থটির শীর্ষক "বিষয় : নাটক" হলেও অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ-গুলি ব্যাপক অর্থে নাটকের আলোচনা নয়। দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সবকটি নিবন্ধেরই বিষয় বিশেষভাবে বাংলাদেশের নাটক এবং নাট্য-আন্দোলন। নিবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৭৩ থেকে শুরু করে ১৯৮৭—বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে স্বাধীনোত্তর কালের এক যুগ। এই এক যুগের নাট্যচর্চার বিশ্লেষণ ছাড়াও বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে একজন নাট্য-কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে এইসব রচনায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে যে প্রতিরোধ ধীরে-ধীরে দানা বাঁধছিল তার প্রকাশ ঘটে তৎকালীন বাঙলা নাটকের রচনায়, প্রযোজনায়। প্রতি-বাদের এই মাধ্যমটির কণ্ঠরোধ করার জন্য ১৯৭৬ সালে জারি হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন, যে আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নাটক প্রযোজনা বন্ধ হয়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে এই আইনটি সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশে এত বছর পরেও এই গণতন্ত্রবিরোধী আইনটি বলবৎ আছে এবং নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যকর্মীদের নিরন্তর এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। "নাটক বন্ধ" এবং "অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের আন্দোলন" নিবন্ধ দুটি এই সংগ্রামের সমর্থনে লেখা। ১৯৭২-৭৩ থেকে বাংলাদেশের অপেশাদারি নাট্যগোষ্ঠীগুলি, যাঁদের এই গ্রন্থের লেখকও "গ্রুপ থিয়েটার" বলে নির্দিষ্ট করছেন, নিম্ন মত নাট্যাভিনয়ের একটি রীতি চালু করেন। ধীরে-ধীরে ঢাকা এবং অন্যান্য শহরেও

নাটকের আগ্রহী দর্শক তৈরি হতে শুরু করে। ঠিক এই সময় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও পরবর্তী বেঙ্গল অ্যামিউজমেনট ট্যাক্স আইন জারি করে বাংলাদেশ সরকার নাট্যচর্চার এই জয়যাত্রাকে ব্যাহত করেন। 'নাটক বন্ধ'-এ লেখক নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদকর আইন, তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এবং বর্তমান বাঙলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতের তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছেন যে এই আইনদুটি কতটা অবান্তর। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যগোষ্ঠীগুলির নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য, অনুদান ইত্যাদির উল্লেখ করে শুধু নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল বা প্রমোদকর রদ নয়, নাট্যগোষ্ঠীগুলির জন্য সরকারি অনুদানের দাবিও জানিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের মে মাসে রচিত হয় এই নিবন্ধটি। ওপার বাঙলার সমস্ত নাট্যদলগুলির পক্ষে উচ্চারিত এই দাবি আংশিকভাবে মেনে নেন শেখ মুজিবুর রহমান ওই সালেরই জুন মাসে। তাঁর আদেশানুযায়ী প্রমোদকর প্রত্যাহৃত এবং নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় নিবন্ধটির রচনাকাল অনুল্লিখিত থাকলেও মনে হয় এটি ১৯৮৪ সালে লিখিত। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বর্ণনা করে লেখক দেখিয়েছেন যে কাগজে কলমে আইনের সংশোধন হওয়া সত্ত্বেও কার্যত সেনসরশিপ প্রায় সমানভাবেই বাংলাদেশের সর্বত্র বজায় আছে। তবে শহরের প্রাধান্য অনুযায়ী মাত্রার তফাত আছে। ঢাকায় বা অন্য বড়ো শহরগুলিতে এই আইনের তত কড়াকড়ি না থাকলেও মফস্বলে তা পূর্ণমাত্রায় বহাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কুমিল্লার একটি নাট্যগোষ্ঠীর হয়রানির বর্ণনা দিয়েছেন যাঁদের প্রযোজনা "এখন দুঃসময়"-এর নাম পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ কারণ তাঁদের মতে "তখন দেশের দুঃসময় নয়, সুসময়" (পৃ ৪৮)। আশার কথা, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন অন্যায় আইনগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই আন্দোলনে শামিল আজ বাংলাদেশের বহু নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী। নিবন্ধটির পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক ও জরুরি দলিলগুলির প্রতিলিপি সংকলিত করে লেখক আগ্রহী পাঠক ও নাট্যামোদীর এষণা নিবৃত্তি করেছেন।

"হায় মঞ্চ" নিবন্ধটি বাংলাদেশী নাট্যদলগুলির আরেকটি জরুরি দাবিকে পুরোভাগে এনেছে। ঢাকা শহরের নাট্যদলগুলির সংখ্যার তুলনায় প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা নগণ্য। ১৯৭৯ সালে লেখা নিবন্ধটিতে জানা যাচ্ছে, মঞ্চায়ন-উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ ঢাকা শহরে তখন একটিই—মহিলা সমিতির মিলনায়তন। পরবর্তী কালে অবশ্য আরও দু-একটি প্রেক্ষাগৃহে দলগুলি প্রায় বাধ্য হয়েই প্রযোজনা করতে শুরু করেছেন। নাট্যদলগুলির কর্মতৎপরতা এবং সৃষ্টিশীলতা সত্ত্বেও কিছু অভিনয়স্থানের অভাব পূরণ করার জন্য সরকার কোনোভাবে এগিয়ে আসেন নি। নাট্যগোষ্ঠীগুলির দাবি সরকার তাঁদের জন্য একটি নাটক মঞ্চায়নের উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে সাহায্য করুন। ইদানীংকালে, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের বাহকহিসেবে এই দাবির রূপায়ণ তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

"ফেডারেশন আমাদের শক্তি, আমাদের সাহস" বাংলাদেশের একশো তিনটি (বর্তমানে ১১০) নাট্যদলের সংগঠনের প্রতিষ্ঠার চার বছর পরে ১৯৮৫ সালে রচিত। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারশনের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে লেখক এই নিবন্ধে ফেডারেশনের কার্যনীতি এবং ক্রিয়াকাণ্ডের একটা খতিয়ান দাখিল করেছেন। এই সংগঠনের ব্যর্থতা আর সফলতা—দুইয়ের সমান্তরাল বিচার করে লেখক পরিশেষে ঘোষণা করেছেন, এই ফেডারেশন বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের শক্তি আর সাহসের অন্যতম প্রধান উৎস।

বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের সমস্যাগুলির বহুস্তর রূপ ধরা পড়েছে এই সংকলনের "আমরা কি করছি?" প্রবন্ধে। পরিপার্শ্ব-সচেতন, বক্তব্য-সম্বলিত নাটকের স্বল্পতা, অভিনয়যোগ্য মঞ্চের বিরলতা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাট্য-মাধ্যমের প্রতি সরকারি অবহেলা, প্রকৃত নাট্য-সমালোচনার এবং নাট্য-আলোচনার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার যথার্থ পরিবেশটি গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ নাটকের একটি বিশেষ দর্শকসমাজ তৈরি করা গত কয়েক বছরেই সম্ভব হয়েছে। "নাট্যকর্মীর সামাজিক দায়িত্ব" নিবন্ধটি পূর্ব আলোচিত রচনাটির পরিপূরক। বাংলাদেশের একজন "গ্রুপ থিয়েটার" কর্মীকে কতখানি আত্মত্যাগ এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে তাঁর নাট্যচর্চার আদর্শকে বজায় রাখতে হয় তার একটি হিসেব পেশ করেছেন লেখক। সেই সঙ্গে থিয়েটার-কর্মীদের সম্বন্ধে সামাজিক দায়িত্বহীনতার যেসব অভিযোগ আনা হয়ে থাকে তার উত্তর দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন যে সামাজিক দায়ভার কেবল একা নাট্যকর্মীর ক্ষেত্রে নয়, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামাজিক দায়িত্ব পালন নাট্যকর্মী যথার্থই করে থাকেন তাঁর একনিষ্ঠ নাট্যচর্চার মধ্যে দিয়ে। জীবিকানির্বাহের পাশাপাশি সেটুকু করতেই তাঁকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সেখানে নাট্যকর্মীরা কেন গ্রামেগঞ্জে পৌছতে পারছেন না বা যৌথ চেষ্টায় জাতীয় রঙ্গালয় নির্মাণ করতে পারলেন না—এ ধরনের অভিযোগ অবান্তর।

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে নাট্যচর্চার সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সাহায্য করে এ সংকলনের দুটি প্রবন্ধ: "আমাদের নাটক : শুরুর ক'বছর", এবং "নির্মাণের এক যুগ"। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন তুলেছিল তার ঢেউ এসে লাগে নাট্যচর্চায়। ফলত দর্শক থেকে পরিচালক পর্যন্ত সকলের মধ্যেই নাটকের মাধ্যমে বাস্তব জীবন ও সমকালীন ইতিহাসকে স্পর্শ করার চাহিদা তৈরি হয়। এই কারণে স্বাধীনতাপরবর্তী কালে নাট্য রচনা এবং প্রযোজনা নতুন মোড় নেয়। স্বাধীনোত্তর যুগের এই নব্য নাট্যচর্চার প্রেক্ষিতে কয়েকজন প্রাচীন ও নবীন নাট্যকারদের নাট্যসৃষ্টির বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন লেখক তাঁর "আমাদের নাটক : শুরুর ক'বছর" প্রবন্ধে। তাঁর মতে, স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যরচনার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি হল "বক্তব্য সম্বলিত / সমসাময়িক জীবনবোধে উজ্জীবিত / ছক কাটা কাহিনী বিবর্জিত এবং আয়তনে সংক্ষিপ্ত" (পৃ ৩৫)। প্রযোজনার ক্ষেত্রে ঢাকার তিনটি প্রধান নাট্যগোষ্ঠীর বক্তব্যের আলোচনার মধ্যে দিয়ে লেখক সাধারণভাবে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকের ভূমিকা কখনোই বিস্মৃত হন নি লেখক। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও বাংলাদেশের নাট্যদলগুলি যে একটি নাট্যোৎসাহী দর্শকশ্রেণী গড়ে তুলতে পেরেছেন সেটাকেই তাঁদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি "নির্মাণের এক যুগ" প্রবন্ধে। প্রায় একই বিষয়ে রচিত তৃতীয় প্রবন্ধ "বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬" বর্তমান আলোচনার আগেই উল্লিখিত হয়েছে যেহেতু সেটি পূর্বে-আলোচিত "বাংলাদেশের নাট্যচর্চা" সংকলনটিরও অন্তর্ভুক্ত।

"সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ" এবং "প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব : একটি পর্যালোচনা" দুটি নিবন্ধই মূলত নাট্যসমালোচনা। ১৮৭২ সালে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকা শহরের "পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি"তে প্রথম টিকিট বিক্রি করে নাটকাভিনয় হয়। ১৯৭২-এ সেই রঙ্গাভিনয়ের শতবর্ষ পালন করা হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ভাবে। এই উপলক্ষে ঢাকার টেলিভিশন, বেতার এবং চট্টগ্রাম বেতারে যে-সমস্ত নাটকের অভিনয় হয় তারই সমালোচনা করা হয়েছে প্রথম নিবন্ধটিতে। ১৯৭৭-এ ঢাকা শহরে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ছাড়াও, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, মুনসীগঞ্জ, সাতক্ষীরা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যদলগুলি এই উৎসবে তাঁদের নাট্যকর্ম প্রদর্শন করেন। প্রযোজনাগুলির গুণগত আলোচনা এবং টিকিট-বিক্রির হার ছাড়াও আয়োজনের দোষগুণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় নিবন্ধটিতে। দুটি রচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশের সমকালীন নাট্যচর্চার একটি প্রত্যক্ষ রূপ প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

এপার বাঙলায় নাটক বা নাটক সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক ধরনের অবহেলা কাজ করে। বাংলাদেশের দুটি প্রকাশক সংস্থার দ্বারা কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থগুলি ওপার বাঙলার নাট্যপ্রকাশনার অবস্থা সম্বন্ধে আশা জাগায়। তবে তিনটি গ্রন্থের মুদ্রণেই আরও অনেকখানি যত্নের প্রয়োজন ছিল। ছাপা, বাঁধাই বা ফরম্যাট সুন্দর হলেও অসংখ্য ছাপার ভুলে তিনটি বই আকীর্ণ।

এ ছাড়া প্রবন্ধসংকলন দুটিতে তথ্যগত কিছু অস্পষ্টতা চোখে পড়লো। "বাংলাদেশের নাট্যচর্চা" সংকলনে "সাহিত্য হিসেবে নাটক" প্রবন্ধে আবদুল হক লিখছেন, "গ্রীক নাটক বলুন অথবা এলিজাবেথীয় নাটক—নাটক লেখার একটা প্রতিষ্ঠিত রীতি ছিল এবং অনেক সাধনায় সে রীতি নাট্যকারদের আয়ত্ত করতে হতো। 'পোয়েটিকস্'-এর মতো কোনো গ্রন্থ এলিজাবেথীয় আমলে ছিল না... বাঙলা নাটক তেমন 'পোয়েটিকস্'-এর মত কোনো নাট্যতত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি" (পৃ ২৯-৩০)। এই পঙক্তিগুলি পড়লে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গ্রীক নাটক রচনার রীতি 'পোয়েটিকস্' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু গ্রীক নাটক রচনার অনেক পরে 'পোয়েটিকস্' রচিত হয়। প্রধানত গ্রীক ট্রাজেডিসমূহের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে

আরিসতোতল্ এই গ্রন্থ রচনা করেন। সংকলনের "মঞ্চে অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে" প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" এর অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে 'চন্দ্রাবতী'-র উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ ৪৬)। বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন শরৎচন্দ্রের নায়িকার নাম "চন্দ্রমুখী", "চন্দ্রাবতী" নয়। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর রচনায় ১৭৯৫ সালে লেবেডেফ-প্রযোজিত বাঙলা নাটকের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "লেবেডেফের প্রযোজনায় বাঙলায় রূপান্তরিত 'ছদ্মবেশী' নাটকের অভিনয়" (পৃ ১১৯)। লেখক এক্ষেত্রে হয়তো এম. জডরেল-এর "দ্য ডিসগাইস" নাটকটির নাম বাঙলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। অথচ অন্যত্র তিনি ইবসেনের নাটক "ডলস হাউস" নামটির কোনো আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। ফলে মনে হতে পারে "দ্য ডিসগাইস'-এর লেবেডেফ-কৃত বাঙলা সংস্করণটির নাম "ছদ্মবেশী"। লেবেডেফের বাঙলা রূপান্তরের নাম ছিল—"কাল্পনিক সংবদল"। রামেন্দু মজুমদার প্রণীত প্রবন্ধ-সংকলনটিতে সন-তারিখে দু-একটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ল। সম্ভবত এগুলি মুদ্রণপ্রমাদ। যেমন নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত আলোচনায় (নাটক বন্ধ) আইন তৈরির প্রস্তুতির বিবরণে এক জায়গায় ছাপা হয়েছে 'ভারত সরকার ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট ২৬ নং চিঠিতে সেক্রেটারী অফ স্টেট 'ফর ইণ্ডিয়া' কে যে চিঠি লিখলেন…' (পৃ-১৩)। ভুল ছাপার দরুন নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রায় একই বিষয়ে লেখা অন্য আর-একটি নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে নাট্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনায় লেখক বলছেন, '১৯৬২ সালে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নতুন নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেন।…পরে ওই বছরই যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে আইনটি বাতিল করেন।' (পৃ ৪৬)। নাট্যনিয়ন্ত্রণ পশ্চিমবঙ্গে চালু করার চেষ্টা হয় ১৯৬৬ সালে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন ১৯৬৭ সালে। আশা করি আলোচিত বইগুলির আগামী সংস্করণে এইসব ছোটোখাটো ভুল-ভ্রান্তি সংশোধিত হবে।

বাঙলাদেশের নব্য নাট্য-আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ছিল এপার বাঙলার নাট্যচর্চা। সেই প্রেরণার বীজ আজ মহীরুহে পরিণত। ওপার বাঙলার নাট্যক্ষেত্র এখন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রাণবন্ত কর্মভূমি। এদিকে এপার বাঙলার নাট্যচর্চায় এসেছে দুঃসময়, ষাট-সত্তরের সৃষ্টিশীল আন্দোলন আজ মুমূর্ষ। এই সন্ধিলগ্নে ওপার বাঙলার নাট্য আন্দোলন এই বাঙলার নাট্যচর্চায় যেমন নতুন উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে তেমনি ওপার বাঙলার নাট্যমানসও ধনী হয়ে উঠতে পারে এপার বাঙলার নাট্য-অভিজ্ঞতায়। আর তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে দুই নাট্যজগতের নিয়মিত আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য তিনটি গ্রন্থ এপার বাঙলার নাট্যোৎসাহী পাঠক থেকে শুরু করে নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী—সবার কাছেই সমান স্বাগত।

চিত্রকলা

ছবির কবিতা : বিকাশ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক ছবি

বিকাশ ভট্টাচার্যের একক চিত্রপ্রদর্শনী। বিড়লা অকাদেমী। ৮-১১ অকটোবর ১৯৮৭

শিল্পী কোথায় শিক্ষালাভ করেছেন, কতবার স্বদেশে-বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছেন বা কী কী পুরস্কার জুটেছে, এই -সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিতে শিল্পীর গুরুত্ব এবং পারদর্শিতা বিচার করা বর্তমান কালের একটি লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাপ্তাহিক-দৈনিক কাগজের কল্যাণে। চিত্রশিল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌছোয় প্রদর্শনী কিংবা কোনো পত্রিকার মাধ্যমে। ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে সাধারণ মানুষের কাছে চিত্রকলা বরাবরই দূরের জগৎ। ফলে, চিত্রকলা মানেই বোঝায় কয়েকজন পয়সাওলার অন্দরমহল, ড্রয়িংরুম শোভনের ব্যাপার। শিল্প তো শেষ পর্যন্তও বেঁচে থাকে সাধারণ মানুষের কাছেই, শিল্প তো শিল্পরসিকদের একেবারেই নিজস্ব সম্পত্তি। অথচ শিল্পকে সমস্ত শিল্পরসিকদের কাছে পৌছে দিতে মুদ্রণ ছাড়া তো কোন উপায় নেই। এবং এই কাজটি করে পত্র-পত্রিকা। বাঙলা ভাষায় 'সুন্দরমের' পর আর কোনো নতুন করে শুধুমাত্র শিল্পের কাগজ বেরোয় নি। ফলে চিত্রকলা এবং শিল্পীরা পরিপূর্ণভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক, প্রদর্শনী-কেন্দ্রের মধ্যে আবদ্ধ আর সাপ্তাহিক-দৈনিকের বিভাগ ভরতির একটি আকর্ষণীয় উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিকাশ ভট্টাচার্য সেদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান। "দেশ" পত্রিকায় সমরেশ বসুর "দেখি নাই ফিরে"-র নিয়মিত অলংকরণের ফলে আলংকারিক পরিসীমাকে ছাপিয়েও শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। আর ওই ছবিগুলি দেখতে-দেখতে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি দেখার প্রস্তুতিপর্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেমন, তেমনি তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্যগুলিও ক্রমে শিল্পরসিকের কাছে স্পষ্টতা পাচ্ছে।

আটটি স্তরে ভাগ করে মোট ৪০টি ছবি নিয়ে বর্তমান প্রদর্শনীটি করলেন বিকাশ ভট্টাচার্য। এক-একটি স্তরে যেতে মূল ছবিগুলির সঙ্গে খুব পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট করে বিকাশ তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন। ফলে ছবিগুলি সমস্ত স্তরের মানুষের কাছেই আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য হয়েছে। এতে করে ছবিগুলি বুঝতে যেমন সুবিধা হয় তেমনি ক্ষতিও কম হয় না। শিল্প-রসিকের নিজস্ব কতকগুলি বাঁধা ধারণা থাকে, তার জানা রূপটিকেই সে পেতে চায় ছবিতে এবং তার সঙ্গে অনুভূতি যুক্ত করে আলাদা এক জগৎ সৃষ্টি করে। সে জগৎ শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে নাও মিলতে পারে, কিন্তু তার স্বাধীন অনুভবকে জোর করে বেঁধে রাখবার অধিকার কি শিল্পীর থাকে, যদি তাঁর সৃষ্টি দিয়ে অনিবার্যভাবে কোনো ভাবনা বা অনুভবকে নির্দিষ্ট করতে না পারেন? শিল্পরসিক সবসময় জানেন শিল্পী তাঁর একেবারেই চেনা, গভীর, নিবিড়, আত্মীয় জগৎকেই ছবিতে মূর্ত করেন। চেনা মানুষটি চেনা গাছটি, চেনা কুকুরটিকে গ্রহণ করেই সময়ের, জাতির, সভ্যতার প্রতিচ্ছবি আঁকেন। সেখানে বিজ্ঞাপিত করার কী থাকে আর? শিল্পই তো শিল্পীর চরম পরিচয়। এই পরিচয় স্থাপনে কোন ঘাটতি লক্ষ করেছেন কি বিকাশ ভট্টাচার্য? প্রদর্শনীর সমস্ত ছবিগুলির মধ্যে ইলাসট্রেশন ধর্মই এককভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

এর ফলে ছবিগুলো হয়েছে অনেক সরল। ক্রমেই বিমূর্ত ছবির প্রদর্শনী দেখতে-দেখতে চোখ থমকে যায় এই পর্যন্ত।

ছবিগুলোর আকর্ষণক্ষমতা এর সূক্ষ্মতার কারণে। যেমন নারী পর্যায়ের ছবিগুলোতে আলোর প্রার্থনা যদি যুক্ত না হত, ছবিগুলো হয়ে উঠত নিছকই ছবি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জানালার ধারে অপেক্ষমাণা মহিলার আলোর প্রার্থনা ক্রমেই অবরুদ্ধ জীবনকে ইঙ্গিত করে। এক ভিন্নতর তাৎপর্যে বিস্তৃত হয়ে যায় ওই একই নারী পরবর্তী পর্যায়ে। ঠিক এমনি ভাবে পুকুর পর্যায়ের ছবিগুলোতেও শিল্পীর নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার স্বয়ং-প্রকাশ। ঋতুপরিবর্তনের ধারায়, সমাজ, রিচুয়াল পরিপ্রেক্ষিতের অনুষঙ্গে বর্তমানের প্রকৃতির স্বাভাবিকত্বকে মানুষ কিভাবে ক্রমে নষ্ট করে আত্মঘাতী হয়ে উঠছে, তার অপূর্ব চিত্রভাষা। পণ্ডস-৮ ছবিটি মরুভূমির মতোন ধূ ধূ। টলটলায়মান পুকুরের চাকচিক্য ক্রমশ ধূ ধূ-র অভিমুখী বিকাশ ভট্টাচার্য যেন এটাকেই স্পষ্ট করতে চান। ভেণ্ডারস পর্যায়ের ছবির মধ্যেই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাঁর সমাজবোধ বর্তমান সমস্ত ছবির মধ্যেই, কিন্তু বড্ডো চাপা। ইঙ্গিতে সেরে দেন। এই কারণে তাঁর বিষয়-

মুখর ছবিগুলোকে হতে হয়েছে নীরব কবিতা। দেয়াল পর্যায়ের ছবিতে মানুষের দুর্মর অতিক্রমী স্পৃহাকে কবিতার মতোন করে কুহকে এবং সৌন্দর্যের মাধ্যমে মূর্ত করেন। অতি-ক্রম-প্রয়াসী মানুষের চেষ্টাকে, কর্কশতাকে আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতায় নিয়ে আসেন সরল সাবলীল করে। বলা বাহুলা, এতে দু-রকম ইঙ্গিত হয়। স্বাভা বিকভাবে সরলভাবে কর্কশ বিষয়টাকে সুন্দর করে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াও যেমন যায়, তেমনি বিষয়টার বাস্তবতাকে ছাপিয়ে দিয়ে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আটকে দিয়ে দায় এড়ানোও তো যায়। বিকাশ ভট্টা-চার্যের এই ছবিগুলোতে তাই নির্দিষ্ট কোনো ভাবনার প্রতিভাস উঠে আসে না। বরং মনে হয়, তিনি যেন আপোসী। বোঝেন সমস্ত, বাস্তবতার উপর দখল এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা বর্তমান সত্ত্বেও তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তাঁর মানুষেরা ক্লান্ত, বিষণ্ণ, পরা-জিত, এবং প্রার্থিত। জেহাদ নেই একটুও। তবু শেষ পর্যন্তও তিনি মানবতাবাদী। বারে-বারে নানাভাবে ফিরে-ফিরে এসেছে গাছ, গাছের পাতা। সজীব, উচ্ছল প্রাণবন্ত সবুজ। সবুজে-সবুজে একাকার কোনো-কোনো ছবি। মরুভূমির ধূসর পটেও লকলকে সবুজ। সবুজ আর রুক্ষতার পাশাপাশি অবস্থানের বৈপরীত্যে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা এসেছে কোনো-কোনো ছবিতে।

প্রদর্শিত ছবিগুলি ক্রেয়ন, চার-কোল, চক, জলরঙ, কোথাও মিশ্র উপাদানে আঁকা। জলরঙের ছবিই বেশি। বিকাশ মনে করেন, তেলরঙ থেকে ক্রমে জলরঙে চলে আসা তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। তিনি জানেন যে-কোনো মিডিয়মই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ-দক্ষতার অধীন। ছবিগুলিতে শিল্পীর নিপুণতা বর্তমান।

প্রদর্শিত ৪০টি ছবির ৮টি পর্যায়ের বৈচিত্র্যেই টেনে রাখে। বিকাশ ভট্টা-চার্য মূর্তিকে ধরে ক্রমশ বিমূর্ততার দিকে গেছেন। শুদ্ধ বাস্তবতাকে ছাপিয়ে এক মরমি অনুভবের দিকে নিয়ে গেছেন যা শুদ্ধ কবিতায় পাওয়া যায়। তবে ছদ্মভাবে, প্রশ্নাকুল সময়কে, সংশয়কে স্বীকার করেও এড়িয়ে-এড়িয়ে। বিকাশ ভট্টাচার্যের পিছলে পালানোই এই প্রদর্শনীর ছবিগুলিতে বড়ো স্পষ্ট করে চোখে পড়ে।

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

IN-LAWS OR OUTLAWS

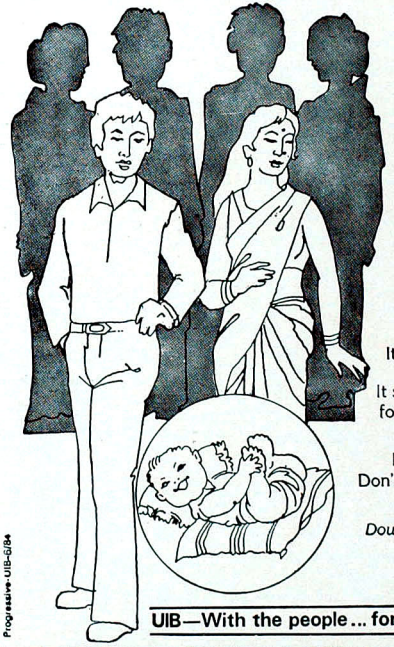

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come.

Help eradicate dowry.
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

Remember,
Dowry is prohibited by law.

Progressive-UIB-6/84

UIB—With the people ... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001